শারদ সংখ্যা ১৪২৯

# বই কুটির কলকাতা

# ভূমিকা

এক বছর পূর্ণ হলো আমাদের বই কুটির কলকাতার পুজো স্পেশাল সংখ্যার " *শারদ সংখ্যা ১৪২৯*"। মহামারী কবলে শুধু মাত্র *Facebook*-এর একটা পেজ থেকে শুরু হওয়া এই বই কুটির কলকাতা আজ শৈশবের সময় পেরিয়ে কৈশোরের দিকে এগোতে উৎসাহী। আমরা আমাদের শাখা - প্রশাখা বিস্তার করেছি Facebook থেকে *Instagram* থেকে *Website*-এ। তেমনি পরিচয় স্থাপন হয়েছে বহু লেখক ও পাঠকদের সাথে। তাদের আশীর্বাদে গত এক বছরে আমরা ছয়টি সংখ্যা প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছি। আমরা চাই আরও আপনাদের অপ্রকাশিত লেখা প্রকাশ করতে আর পাঠকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। সেই উৎসাহের আমরা ব্রতী এবং সেই কারণেই আবার আপনাদের কাছে আত্মপ্রকাশ ঘটতে চলেছে " ***শারদ সংখ্যা ১৪২৯***"। কিছু চেনা কিছু অচেনা লেখক, লেখিকা ও চিত্র শিল্পীদের নিয়ে এই শারদ অর্ঘ্যের ডালি সাজিয়ে প্রকাশিত হয়েছে আমাদের "**বই কুটির কলকাতা**"-র " *শারদ সংখ্যা ১৪২৯*"। আশাকরি প্রতিবারের মতো এবারও আপনাদের পছন্দ হবে আমাদের এই শারদ সংখ্যা, আর প্রতিবারের মতোই আমাদের এমন ভাবেই ভালোবাসবেন। আপনাদের প্রশংসা আমাদেরকে আরো উৎসাহিত করবে আগামী দিনগুলোয় " ***বই কুটির কলকাতা***"কে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

বই
কুটির
কলকাতা

শারদ সংখ্যা
১৪২৯

# সম্পাদকীয়

বাঙালিদের জীবনে অতি গুরুত্বপূর্ণ ও অতি উৎসাহী উৎসব হলো এই দুর্গাপুজো। বাংলা সহ কলকাতা তথা বাংলাভাষী তো বটেই আপামোর পূর্ব ভারতের দুর্গাপুজোর রমরমা চোখে পড়ার মতো।তারপর গত বছর ইউনেস্কোর তরফ থেকে যখন দুর্গাপুজোকে হেরিটেজ আক্ষা দেয় তখন বাঙালি হিসেবে গর্ব কম হয়নি আমাদের। যাইহোক দুর্গাপুজো ও শারদীয়া পত্রিকা এক অবকল্পনীয় মেলবন্ধন। এই মেলবন্ধনের আত্মিক দিকটি মাথায় রেখে ও সামাজিক অগ্রগতির সাথে সমান তালে তাল মিলিয়ে এক নতুন প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হয়েছি আমরা "বই কুটির কলকাতা"। আজ এক বছর যাবত মোট পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশ করতে পেরেছি, তাতে আপনাদের অর্থাৎ পাঠক-পাঠিকাদের ভূমিকাই অগ্রগণ্য। সেই ভূমিকা যেন আরো উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় তাই আমাদের এই পুজোর দ্বিতীয় "***শারদ সংখ্যা ১৪২৯***"। মহামারীর কবল থেকে শুরু করে আজ ছয়টি পত্রিকা প্রকাশ করলাম আমরা,এটা একটা যাত্রা অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও আজ আমরা এগোচ্ছি আর এই বাস্তবটাই আমাদের কাছে আনন্দের। এই আনন্দের সেতু হিসেবে লেখক-লেখিকা, চিত্র শিল্পী ও পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে যোগসূত্রের কাজ করে চলেছে "*বই কুটির কলকাতা*"। আমরা চাই আপনাদের আশীর্বাদ, ভালোবাসাকে পাথেও করে আগামী দিন গুলি ভালোভাবে এগোতে। মাতৃ আরাধনার শুভ ক্ষণে মহালয়ার দিন আমাদের দ্বিতীয় শারদ সংখ্যা ১৪২৯ প্রকাশ হলো। কেমন লাগলো আপনাদের উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম।

--শুভজিৎ কুন্ডু

সম্পাদক, বই কুটির কলকাতা

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

জুনালী বেজ (প্রচ্ছদ)

পৃথা দে

আরাত্রিকা মন্ডল (শিশু শিল্পী)

অপলা মিত্র

বাপ্পা ভৌমিক

বর্ষা মন্ডল

সুপর্না কামাতি

বই কুটির কলকাতা

শারদ সংখ্যা ১৪২৯

# সূচীপত্র

## উপলব্ধি


অভিজিৎ বাবুলি

অন্তঃসলিলা


## কবিতা



| | |
|---|---|
| কৃপাময়ী মা | অন্তঃসলিলা |
| এসো মা দুর্গা হই | জগন্নাথ মন্ডল |
| তোর সাথে | অরুণ কুমার মন্ডল |
| স্বাধীনতার পঁচাত্তর | রবীন মুখার্জী |
| মৃত চোখ | দীপঙ্কর বিশ্বাস |
| বেঁচে থাকা | অরুণ কুমার মন্ডল |
| নিস্তব্ধতার ভয় | সুনন্দ সান্যাল |
| পাণ্ডুলিপি | দীপঙ্কর বিশ্বাস |

বই কুটির কলকাতা

শারদ সংখ্যা ১৪২৯

# সূচীপত্র

## ছোট গল্প


কাফিয়ার সন্ধানে — সুনন্দ সান্যাল

মালকোষ — অগ্নিমিতা দাস

অব্যবধান — সুরমিতা চক্রবর্তী


## গল্প


যোগাযোগ — সৈয়দ হুমায়ুন রাণা

নিশির ডাক — অগ্নিমিতা দাস

সঙ্গী — কণিকা সরকার

মুক্তি — বীণা সেনগুপ্ত

আমি ও পুরুষ — অনিকেত দেবনাথ

I LOVE YOU — সীমন্ত রায়

বই কুটির কলকাতা

শারদ সংখ্যা ১৪২৯

# সূচীপত্র

## রচনা


ভারতীয় দর্শনের উৎপত্তি

সঙ্গীতা মন্ডল

বাংলা ও বাঙালির সংস্কৃতি , ধর্ম, সাহিত্য ও সামাজিক জীবনের উৎপত্তি ও বিবর্তন

রবিন মুখার্জি


## ভ্রমণ


অরণ্য অভিযান

সম্রাট বসু রায়

স্মরণীয় অভিজ্ঞতা

অমিত কুমার দে

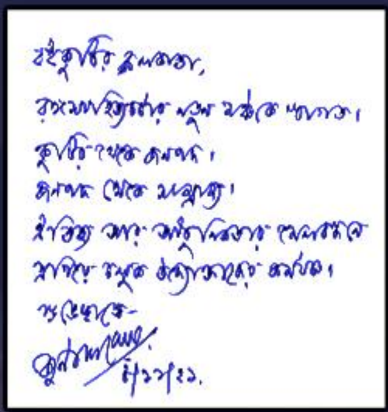

" বই কুটির কলকাতা,
সাহিত্যচর্চার নতুন মঞ্চকে স্বাগত।
কুটির থেকে জনপদ।
জনপদ থেকে সাম্রাজ্য।
ঐতিহ্য আধুনিকতার মেলবন্ধনে
এগিয়ে চলুক উদ্যোক্তাদের কর্মযজ্ঞ।
শুভেচ্ছান্তে "-কুণাল ঘোষ

বিশিষ্ট সাংবাদিক, লেখক এবং রাজনীতিবিদ

"বই কুটির কলকাতার জন্য রইল
অনেক অনেক শুভেচ্ছা "-
চন্দন সেন

প্রখ্যাত নাট্যকার, অভিনেতা এবং লেখক।

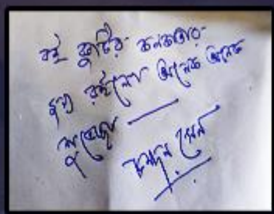

--পৃথা দে

# *** উপলব্ধি ***

জানি না তুমি কবে ছুঁলে  
মনের কঠিন দোর ....  
থাকবে কিনা খুঁজবে তাঁরে ....  
যে আনবে নতুনের ভোর॥  
আমিও আনতে পারি ....  
যদি রাখ বিশ্বাসের সুতো  
তুলনা বন্ধ হলেই  
মিটে যাব সব ক্ষত॥

-অভিজিৎ বাকুলি

আজ হোক প্রতিজ্ঞার পথচলা ...  
অতীতের অপমান  
সব হোক বলিদান ...  
নির্মল হৃদয়ে গোথিত হোক  
সংকল্পের বীজ ...  
সাফল্যের  ফল মিষ্ট হবে  
অবিক্ষয় দৃঢ়তা নিশ্চিত ॥

-অভিজিৎ বাকুলি

# *** উপলব্ধি ***

তোমার চোখে রয়েছে শুধু ...
অনুকরণের মেঘ ....
স্বাতন্ত্র্যতা ভুলেই গেছো ...
প্রত্যক্ষ করে সাফল্যের বেগ....
তুলনা করে করেছ তুমি
ক্ষুদ্র নরক কীট ....
ভালোবাসা নাকি তাকেই ছিল ...
ছিল বিশ্বাসের ভীত ....
তা আজ হয়েছে শিথিল
তৃতীয় করোর আগমনে ...
ভালো থাক এভালোবাসাগুলি
চিরকাল মনের চোরা কোণে।।

-অভিজিৎ বাগুলি

--অপলা মিত্র

# কৃপাময়ী মা

অন্তঃসলিলা

আমি পারিনা, তোমার মতো করে অবলীলায় অবহেলা করতে।

আমি পারিনা, তোমার মতো করে গুছিয়ে অসম্মান করতে।

আমি পারিনা তোমার মতো করে মোহমায়ায় জড়াতে।

আমি পারিনা তোমার মতো করে মিছে দয়া দেখাতে।

আমি পারিনা তোমার মতো করে ছলনা করতে।

আমি পারিনা তোমার মতো করে অভিনয় করতে।

আমি পারিনা তোমার মতো করে ধীরে ধীরে নিজের কাছে টানতে।

আমি পারিনা তোমার মতো করে আকর্ষণ করতে।

আমি পারিনা তোমার মতো করে ছন্নছাড়া করতে।

আমি পারিনা তোমার মতো করে দুঃখ দিতে।

আমি পারিনা তোমার মতো করে রক্তাক্ত করতে।

তুমি নাকি জগজ্জননী মা।

তবে তোমার সন্তানের এতো কষ্ট কেন?

যে নিজের গর্ভধারিণী মাকে ভুলে তোমার কাছে ছুটে যায়,

যে জন্মদাতা পিতা কে ভুলে তোমার কাছে ছুটে যায়,

তাকে তুমি কেন কষ্ট দাও?

কেন তুমি আঘাত করো?

কেন করো ক্ষতবিক্ষত?

আমি তোমার ভক্ত নই,

পতিই আমার দেবতা।

পতি আমার ধ্যান, জ্ঞান,

পতিই আমার দিব্য দর্শন।

পতির ভালোয় আমার ভালো

পতিই আমার জগতের আলো।

আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, পিতা মাতা, পত্নী সবাই তার কাছে তুচ্ছ,

তুমি ই তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে জড়িয়ে আছো।

আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় অন্তরের নয়, বহির্জগতে আমি তাঁর পত্নী, অন্তরে শুধু তোমার স্থান।

নিছক একসঙ্গে থাকার বাহানা মাত্র, মিথ্যে আমাদের প্রেম, মিথ্যে আমাদের ভালোবাসা।

দুটি প্রাণীর একসাথে থাকার মিথ্যে অভিনয়,

আমার প্রেম, ভালোবাসা চরম সত্য, একেবারে খাঁটি,

শুধু তার তুমিই সব, আমি কিছু নয়,

মিথ্যে আমার সাজানো সাধের সংসার।

দরিদ্র চাষীর ঘরের মেয়ে আমি

স্বপ্ন ছিল সুখে সংসার করা।

ভোর বেলা পতি দেবতাকে প্রণাম করে সংসারের কাজ সারা, স্নান করে ফুল তুলে, মালা গেঁথে, আরতি করে,পূজো করা।

তারপর নানা পদ রান্না করে সকলকে ভোজন করানো।

কাংস থালায় পতিকে ভোজন দিয়ে, গলায় কাপড় দিয়ে বসে, হাতে তালপাতার বাতাসি নিয়ে বাতাস দেওয়া।

সন্ধ্যায় তুলসী তলায় প্রদীপ দিয়ে, শঙ্খ বাজিয়ে, গলবস্ত্র হয়ে সকলের জন্য মঙ্গল কামনা করা।

সব কাজ সেরে রাতে পতির পদ সেবা করে ঘুমানো।

এই আমার সাধের সংসারের বর্ণনা।

তুমি তো আমার এই সাধের সংসার করতে দিলে না।

পতির মনে শুধু তুমি মা, তোমার প্রতি তার টান,

আমার চোখে ঝরছে অশ্রু, বাড়ছে অভিমান।

আমার সমগ্র পৃথিবী জুড়ে কেবল আমার পতি।

পতিই আমার ধর্ম, পতিই আমার পরমগতি।

তাঁর পৃথিবী জুড়ে কেবল তুমি,

আমার স্থান কোথাও নেই,

কেবল বাইরে আমি তাঁর পত্নী।

তাঁর সমগ্র হৃদয় জুড়ে প্রাণের প্রিয় মা,

সদা সুখে রেখো আমার পতিকে

তাকে কখনও কষ্ট দিওনা।

তোমার কাছে একটাই প্রার্থনা।

আমি সব মেনে নিলাম হাসিমুখে,

বিনিময়ে আমার পতি কে রেখো মহাসুখে।

মাগো তুমি, মোর পতির প্রাণ,

চিরদিন তাকে রেখো সুখে, দিওনা দুঃখ, কষ্ট অভিমান।

আমি যেন পতির সনে তোমার কৃপা পাই,

পতিকে রেখে সুখে এয়ো হয়ে যেন আমি যাই।

***

A

A

A

A

# এসো মা দুর্গা হই

জগন্নাথ মন্ডল

মা দুর্গা তুই দুর্গতি নাশিনী।
তুই মা দশ প্রহরণ ধারিনী।
আমাকেও অস্ত্রশস্ত্র দে মা।
অন্যায় অত্যাচারে দিই বাধা।
শ্বশুর বাড়ি থেকে বাড়িতে এসে।
আমিও দুর্জন দের ছাই দি ফেলে।
নিজ ভূ সম্পত্তি রক্ষা করি ঠিক।
দুর্জনেরা পালিয়ে গিয়ে দূরে ডেরা নিক।
মরতে তো আর বলতে পারিনা।
তাই উল্টা পাল্টা মন্তব্য ছাড়িনা।

# তোর সাথে

অরুণ কুমার মন্ডল

তোর সাথে যদি কথা বলি
মনে মনে কারো রাগ হয়
তোর থেকে দূরে সরে গেলে
কারো নয়,আমারি কষ্ট হয়!
দিন গড়িয়ে দুপুর, রাত গড়িয়ে ভোর
যখন যেটুকু পাই, ছবি আঁকি তোর!
কাছাকাছি কত কথা হয়
তোর সাথে সব কথা চলে
শোক তাপ গেলে গেলে জল
ভালোবাসা তোর ছোঁয়া পেলে!
সংসার অসুখের যত হলাহল
দোষ কাটে, তোর সাথে থাকা মঙ্গল।
এই ভাবে যত দিন যায়
ফল্গুর ধারা যেন ধায় -
শরীরে পচন ধরার আগে
মন যেন মাটি ছুঁতে পায়!
অবজ্ঞা অবহেলায় কেউ যদি ভোলে
তোর সাথে থেকে যাবো সময়ের কোলে।

***

# মৃত চোখ

দীপঙ্কর বিশ্বাস

খুশিতে চাঁদ পাওয়ার স্বপ্ন দেখেও
অবিশ্বাস সকল আমাকে আহত করে!
আলো আঁধারি অন্ধগলি হতে
বিশ্বাস ফিরে আসে না একেবারেই!
হারানো সুরের ধূন শুনতে পাই আবার,
বোঝা সহজ নয় কখন বেলার যবনিকাপাত!
পুরানো ব্যথারা মাঝে মাঝে চিনচিন করে উঠে
উপলব্ধিতে জানান দেয় ছিলাম একদিন সুখে!
কবিতা ঘুমিয়ে পড়ে তেপান্তরের অচিনপুরে,
আমি ঠিকই বুঝতে পারি হেঁটে চলেছি কোন পথে!

জমাট বাঁধা চিন্তা মস্তিষ্কের রক্ত ক্ষরণে
আমারই সরণ বা প্রতিফলন।
যে ছবি আর জীবন্ত নয় আমারও কাছে,
"লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি" তা এঁকেছিলেন মানস পটে...
জীবিত আজ মৃতচোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে!
বয়ে গেছে এভাবেই কত পক্ষ কাল আঁধারে রেখে;
আমার সময় গুলো চুরি করে!
আমার অন্তপুর সেজে উঠেছে সময়ের তালে;
অথচ ভুলি কি করে যা কিছু স্মরণে আছে!

***

# বেঁচে থাকা

অরুণ কুমার মন্ডল

ঘরের আনাচে কানাচে
সেই কবে থেকে জমে আছে
ধুলো বালি ছাই....
ঘরে ঝাঁটা আছে
ভাঙা কুলো তাও রয়েছে
তবু পঙ্গুত্ব ছেয়ে আছে
এ মন সকলই বিকল....
রংচটা পলেস্তারা খসে যাওয়া ইতিবৃত্তি
দেওয়ালের ফাটল জুড়ে লাগে হাহাকার রব
শূন্যতা, ফাঁদ পাতা মাকড়ের জালে,
শ্বাসনালী চেপে ধরে....
তবু কোন মায়ার কারণে
কায়া শুধু জেগে থাকে -
কুকুরের মতো লেজনেড়ে
এ দোর ও দোর ঘুরে এঁটো পাত ভিক্ষা করে মরে....
কেনই এই নোংরা পুতিগন্ধময়,
আবর্জনার স্তূপে বেঁচে থাকাকে
আমরা সহাস্যে বেঁচে থাকা বলি...!

# নিস্তব্ধতার ভয়

সুনন্দ সান্যাল

শ্যাওলা পড়া কার্ণিশের
রোদ মাখা কাজ
চৈত্রের চালাঘরে
আড়ি পাতে আজ।
দেওয়ালে নেই রূপকথা লেখা
বাস্তব কড়া নাড়ে দরজায়
দুরত্ব মাধুর্য্যবিহীন
গভীরতা বুঝতে শেখায়।
ব্যক্তিত্ব পাল্টায়নি
পরিবর্তিত শুধু এই সময়
প্রসঙ্গ তুমি না হলে সাদাকালো
আবাসনে নিস্তব্ধতার ভয়।

# পাণ্ডুলিপি

দীপঙ্কর বিশ্বাস

ও বলাকা উড়িস কেন ডানা মেলে!
কষ্ট যে দিস আকাশ ফুঁড়ে!
তোর যৌবনদেরাজ ভরা ফুলে ফুলে,
এক দন্ড দাড়াস না তাও এসে!

কুসুম কুসুম কল্পনা তোর হরেক বেণী,
এবার এলে থাকিস কিছুক্ষণ।
শাল পিয়ালের খোলস ছেড়ে এবার বেশি;
নাইতে নেমে ধুয়ে রাখবি মন।

ব কু ক

ও বলাকা উড়িস না তুই একটু কথা শোন!
হাপিত্যেশ ছেড়ে ছুঁড়ে দিবি বন!
হাপুস হাপুস নোনা জলে তোর চোখ কেন!
দেখেশুনে খোদাই করিসখোন!

যাবি যদি এলি কেন তবে তোর শব্দ নিয়ে!
ধরতে গেলে ধরাও দিস তোরে!
পাহাড়চুড়া কতো কথাই তুই গাইলি গানে!
মনের বিকার বিলাপ সুরে এনে!

বলাকা তুই শলাকা নোস;তরল এক কণা!
সোনার মত পরীর হদিস দেনা!
অনন্ত সুখ আছে পড়ে তাও নিক্তি মানা!
তুই হারানো সুখ ফেরত দেনা!

বলাকা তোর সুখীনদী যতই হোক ফেলনা!
তুই ভালোবাসা বেঁধে আয়না!
নাও গড়লি ডানার পরে হরেকরকম খেলনা,
তুফান তুহিন ভরে দিয়ে যানা!

বলাকা তুই আকাশ রেখে দন্ড দিয়ে যানা!
তোকে আর কে করবে মানা!
দন্ড কেটে হত্যে দিয়ে হন্যে মাথার কণা!
তোর পদ্মবনের ঠিকানা দেনা!

তোর বৃষ্টি বৃষ্টি খেলা ভোরের ঘাসে ঝরে!
ধূসর পান্ডুলিপি তোরেই ধরে!
সবুজ ঘাসে মই জুড়লি ঝড়ের দুর্বিপাকে!
পাংশুটে রঙ ধুয়ে দে তুই তুলে!

ও বলাকা তুই নাকি বিদেশিনী কেন মেয়ে!
ভিড়া তরী ফিরে কুলেতে এসে!
তুই যেতে যেতে বলে যাস ফিরে আসবি কবে!
বুঝবি কবে কেউ তোর আছে?

# স্বাধীনতার পঁচাত্তর

## রবীন মুখার্জী

দেশজুড়ে আজ স্বাধীনতা হচ্ছে উদযাপন
পরাধীনতা ও আত্ম গ্লানির আজ হয়েছিল যে মোচন।
শোষণ থেকে মুক্তি পেয়ে জেগে ছিল মনে আশা
নতুন ভাবে দেশ গড়বো দিয়ে ভালোবাসা।

বাল তিলক গর্জে বলে পূর্ণ স্বরাজ লেঙ্গে
জাতির জনক দিয়ে ছিল ডাক করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।
দেশের পতাকা তুলেছিল সুভাষ  প্রথম মণিপুরে
সে সব কীর্তি আজ আমাদের কজনের মনে পরে!

বাংলাকে বৃটিশ করেছিল ভাগ, তবু পারেনি ভাঙ্গতে হৃদয়
রবী ঠাকুরের বাঁধা গানে পেলাম দেশাত্মবোধের উদয়।
অরবিন্দের অস্ত্র বিপ্লবে , যুবসমাজ ছিল  যে উদ্বুদ্ধ
বালক ক্ষুদির ফাঁসির সাজায় দেশ হয়েছিল ভীষণ ক্ষুব্ধ।

মুক্তি সূর্যের কান্ডারি ছিল সবার মাষ্টার দা
বৃটিশ কে মেরে শহীদ হলো তার শীষ্যা ওয়ারদেদা।
অত্যাচারী পুলিশ সিম্পসন, পেয়েছিল পাপের ফল
তিন বীর তাকে হত্যা করে হয়েছিল সফল।

আত্মত্যাগ আর বলিদান দিয়ে পেয়েছি স্বাধীনতা
স্বাধীনতা কেবল ভোগ করে আজ দেশের কতিপয় নেতা।
জনগণ আজ দেখছে, এরা লুটছে গোটা দেশ
তবুও মোদের মুখে তে কুলুপ, কেন, বললে যে হবো শেষ।

এরাই দেশের শেষ কথা, মোদের ভাগ্য ও বিধাতা
এদের বিরুদ্ধে বলবে কে, কার ঘাড়ে আছে কটা মাথা।
শিক্ষা- দিক্ষার ধার ধারে না, ভরায় তিজোরি সকাল-রাতে
তবু, জনগণের সুর চরেনা, কেবল কাঁদে বোসে নিভৃতে।

--বর্ষা মন্ডল

# কাফিয়ার সন্ধানে

সুনন্দ সান্যাল

বহুদিন পরে অফিস ফেরত পথে কাফিয়ার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হলো সুনন্দ সান্যালের। কোনদিন সে ভাবেনি, এই রাস্তায় এইভাবে দেখা হবে। প্রথমে চমকে উঠেছিলো সুনন্দ। এও কি সম্ভব? হতবাক সুনন্দ।

কিছু সময় পরে সম্বিত ফিরলো সুনন্দর। সে তাকালো কাফিয়ার দিকে। নীল রঙের আনারকলি স্যুটে অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। একমাথা কালো কোঁকড়ানো মেঘবরণ চুল। হাওয়ায় উড়ছে। একরাশ মুগ্ধতা পরিবেশে। প্রায় বছর দশ পরে দেখা হলো দুজনার। আজ যেন কৌমুদীতে কুজ্ঝাসম কাদম্বরীর সাথে সাক্ষাৎ হওয়ারই ছিলো।

সুখস্মৃতি রোমন্থনের কাজে মন সক্রিয় হয়েছে। কাফিয়া তার রূপের সৌন্দর্য্য যৌবনকালের মতো ধরে রাখতে সক্ষম। ওর তো বয়স বাড়েনি। অন্যদিকে সুনন্দ নিত্য দিনের ভাবনাচিন্তা ও শ্রমে একবারে বুড়ো হয়ে গেছে।

নীরবে পথ হাঁটছিলো দুজনে। নীরবতা ভঙ্গ করে কাফিয়া প্রথম বলে উঠলো "একটা কথা বলবো?"

গম্ভীর কণ্ঠে সুনন্দ বললো "হ্যাঁ, বলো।"

বিশ্বকবিকে উদ্ধৃত করে কাফিয়া বললো "আচ্ছা! আমাদের যে দিন গেছে চলে, একেবারেই কি গেছে? কিছুই কি নেই বাকি?"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সম্বল করে সুনন্দ জবাবে বললো "রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে।"

"তার তো কোনো লক্ষণ দেখছি না। তোমার সেই কলেজের ডায়েরি, বিভিন্ন রঙে, অক্ষরে, বিভিন্ন ছন্দে আমাকে বন্দী করে রেখে ছিলে একটা দশক। সেই ডায়েরি আজ উইয়ে নষ্ট করে ফেলেছে, তার সঙ্গে আমাকেও কুরে কুরে খেয়েছে। ডায়েরির পাতার পর পাতায় কতো চেষ্টা করে শব্দে ছন্দে গেঁথে যত্ন করে বন্দী করে রাখতে আমায়, সেখানেও আমার আজ কোনো অস্তিত্ব নেই। তোমার মনের মধ্যে জেগে ওঠা আনন্দ, বেদনা, রাগ অভিমান, ভালোবাসা, ঘৃণা, সব অনুভূতি মাখিয়ে দিতে আমার চোখে, মুখে, শিহরিত হতো শরীর। সৃষ্টি সুখের উল্লাসে আমাদের দুজনার মন হেসে উঠতো। সেই সব আচমকা কোথায় উধাও হয়ে গেছে সুনন্দ? জবাব চাই সুনন্দ। জবাব দাও। পালিয়ে যাওয়াটা খুব সহজ। ওটা কাপুরুষতার চিহ্ন..."

কাফিয়া আরও কিছু বলার আগে তার মুখ চেপে ধরলো সুনন্দ। চোখের কোণায় জল বুকে পাহাড়সম ব্যথা চেপে ধরে অপরাধীর মতো নির্বাক নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো সুনন্দ।

গীতবিতানের কয়েকটা লাইন সুনন্দের মস্তিস্কের কোষে কোষে অনুরণন তুললো

"উৎসবে তার আসে নাই কেহ,
বাজে নাই বাঁশি, সাজে নাই গেহ-
কাঁদিয়া তোমায় এনেছে
ডাকিয়া ভাঙামন্দির-দ্বারে।
যতবার আলো জ্বালাতে চাই,
নিবে যায় বারে বারে
আমার জীবনে
তোমার আসন গভীর অন্ধকারে।"

সুনন্দ দেখলো তার কাফিয়া মুখ ভার করে দূরে সরে যাচ্ছে।

সুনন্দ একবার আন্তরিকভাবে প্রচন্ড চিৎকার করে বললো "কাফিয়া, তুমি ফিরে এসো। দেখে যাও, বইকুটিরের প্রকাশনার পাতায় আমি আমার কাফিয়াকে নতুন রূপে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছি। দেখে যাও কাফিয়া। শুধু একটি বার তুমি কি ফিরবে না কাফিয়া?

"কাফিয়া তুমি কি সত্যি আর ফিরবে না?"

***

# মালকোষ

অগ্নিমিতা দাস

সকাল থেকেই সানাই বাজছে। বুকটা মুচড়ে মুচড়ে উঠছে তিন্নির। জানলার পাশে দাঁড়িয়ে কালো ভেলভেট মোড়া চাদরকে আসতে আসতে মিলিয়ে গিয়ে হলদেটে সাদা হতে দেখলো।এই ঘর সংসার সবেতে তার গায়ের গন্ধ লেগে আছে।

এই সানাইয়ের সুর তার বিয়ের নয়। মোড়ের মাথার ডানদিকের বাড়িটা থেকে ভেসে আসছে।

নর্থ ক্যালকাটার এই বাড়িতে সে যখন এসেছিল তখন বয়স হবে একুশ।পাতলা ছিপছিপে তরুণী থেকে এখন সে মধ্যযৌবনা। তিন্নি যেন বাড়িটার সাথে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে আছে। এই বাড়ির ছাদের চোরকুঠুরি থেকে দালানের সব রেলিং তার স্পর্শ জানে। এই বাড়িটাকে সে দুহাত দিয়ে আগলে রেখেছিল। ঘরের মধ্যে মায়ের প্রবেশ _ কি রে  সারা রাত ঘুমোসনি। এইরকম করলে তো শরীর খারাপ হয়ে যাবে । আমি আর বাতের ব্যাথা নিয়ে রেজিস্ট্রি অফিস যেতে পারবো না। তোর দীপুমামা মামী তোর সাথে যাবে। রূপক তো ওর বন্ধুদের নিয়ে সোজা ওখানেই হাজির হবে। আর শোন, খাওয়া দাওয়া কিন্তু তোরা সবাই এখান এসে করবি। একটু পরেই ঠাকুর চলে আসবে। আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব করাবো। তাছাড়া মেরে কেটে তো জনা কুড়ি হবে। সেই নিয়ে আবার ভাবনা আমি মোটেই করি নে। বলতে বলতে তিন্নির মাথায় হাত দিলেন বীথিকা দেবী। তিন্নি উনাকে জড়িয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো। বীথিকা দেবী কান্না জড়ানো গলায় বললেন_ কতবছর লাগলো বলতো তোকে রাজি করাতে। পিছুটান নেই, কতদিন বুড়িটাকে আগলে রাখবি। আমি মরে গেলে কি হবে ! ভাগ্যিস আমার দীপু জোর করে তোকে অফিসে ঢোকালো। তবেই না এমন রত্ন জামাই পেলাম। তাও বাপু তুই ওকে এত বছর ঘোরালি।পাগলি! আমার কাছে তো তুই সবসময় আসবি। রূপক তো তোদের নিউ আলিপুরের ফ্ল্যাটে আমায় থাকতে বলেছিল। নিজের শ্বশুর স্বামীর ভিটে ছেড়ে তাছাড়া বলে তিন্নির ঘরে টাঙানো ছবিটার উজ্জ্বল চেহারার তরুনটির দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেলেন।আজ তাকে মন শক্ত করে কথা রাখতে হবেই। বহুদিন আগে দেওয়া খোকাকে দেওয়া কথা। বাবার বারন না শুনে আর্মিতে গিয়েছিল শেখর। পরে পদোন্নতি হয়ে আর্মির পাইলট হয়েছিল। মায়ের পছন্দের পুতুল কে বিয়ে করে রেখে আবার ফিরে যাওয়ার সময় বলেছিল_ মা, এই চাকরিতে আমাদের কোন ভরসা নেই। তোমার কোন কথাই কোনদিন আমি না করি নি। কিন্তু আমার যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে তন্নিষ্ঠা যেন একলা না থাকে। আমার আত্মার শান্তি হবে না। পুতুল খেলার মতো খেলে ওর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কোন অধিকার আমার নেই। তখন বীথিকা ছেলের মুখ চেপে ধরে চুপ করিয়ে দিলে ও কথাটা তাকে কুরেকুরে খেতে বাধ্য করলো এই কথার চার বছরের মাথায় যখন তিন্নি আদর করে তার চুল বেঁধে ওষুধ খাইয়ে ছাদে দালানে দালানে ঘুরে বেড়াতো।আজ চোখ তুলে দেখলেন শেখরের মুখটা যেন  বেশি হাসিহাসি লাগছে। বাইরে মালকোষের সুরটা এবার কানে লাগছে।

***

# অব্যবধান

## সুরমিতা চক্রবর্তী

"এক লিটার দুধটা জল দিয়ে দিয়ে ঘন করে হাফ লিটার করতে হবে.. নানা ওই বাটিতে না, দুধের বড় ডেঁচাকিতে করবি "

"আচ্ছা প্রথমে গোবিন্দভোগ চালটা ধুয়ে চাপা দিয়ে রাখ।"

"খবরদার আগে চিনি দিবি না তাহলে চাল সেদ্ধ হবে না

"এইতো হয়ে এসছে, কাজু আর কিসমিস টা দিয়ে দে"

"এবার নামিয়ে দে আর ঘন করিস না।"

গরম ধোঁয়া ওঠা পায়েসটা কাচের বাটিতে ঢালতে পারছিল না মিমি। ডেচাকি টা খুব ভারী।

"দাদা, এই দাদা..

একটু পায়েস টা বাটিতে ঢেলে দিবি"

"হ্যাঁ দিচ্ছি, সর দেখি.. আরিব্বাস দারুন দেখতে হয়েছে তো! একটু খেয়ে দেখি দাঁড়া"।

একটা ছোট বাটিতে দু চামচ পায়েস নিয়ে একটু  চেখে দেখলো রানা।

"বাহ! অসাধারণ, এ তো একেবারে মায়ের মতই!!"

"তুই তো একেবারে রান্নাবিদ হয়ে গেছিস রে!!

সকালে কাঁচালঙ্কা কালো জিরে দিয়ে ইলিশ মাছের ঝোলটাও একদম মায়ের মত হয়েছিল। মা চলে যাওয়ার পর থেকে এইরকম মাছের ঝোল আর খাওয়া হয়নি। এক বছর হয়ে গেল.. এই মহামারী আমাদের জীবনটাকে কি রকম ফাঁকা করে দিল নারে..

যাই হোক, তোর জন্মদিন উপলক্ষে ভাগ্যিস তুই রান্নাটা করলি আজকে মালতি মাসির বদলে.. আগে তো মা বলে বলে দিতে, এখন কি করে করিস?

কোথাও কি লিখে রেখেছিস? "

"এখনো তাই..."

জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বেখেয়ালে উত্তর দিল মিমি..

"মানে? "

"না, মানে এখন শিখে গেছি.."

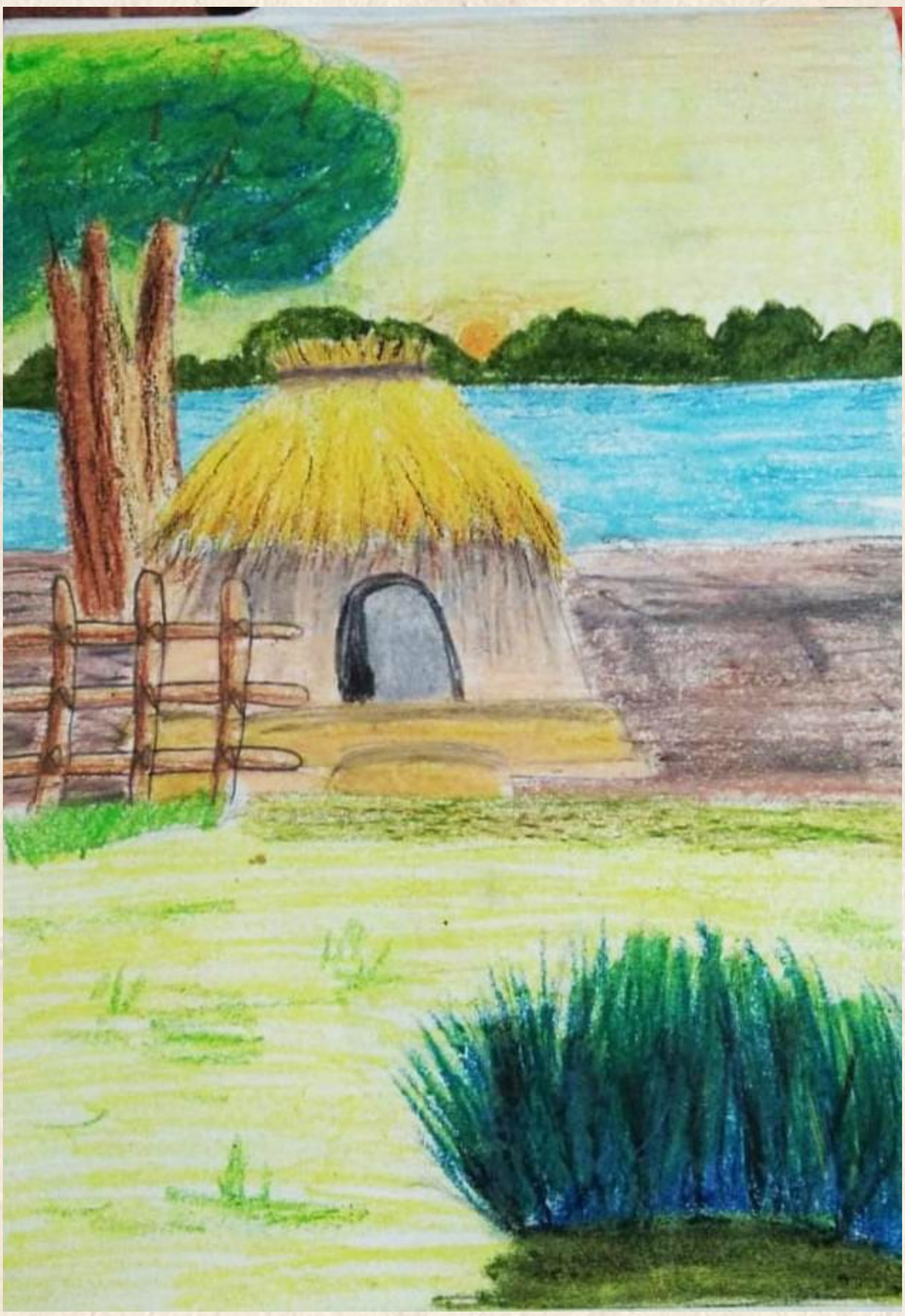

--বর্ষা মন্ডল

# যোগাযোগ

## সৈয়দ হুমায়ুন রাণা

সুনির্মল বাড়ি ঢুকেই খুব হৈ-চৈ বাধিয়ে দিলো। - "মা, মা কে এসেছে দেখ?" সে বাড়িটা যেন মাথায় তোলে এমন অবস্থা। মা, বাবা ও বোন সুতপা ঘর ছেড়ে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন সুনির্মলের চিল চিৎকারে। সবার চোখ একজন আগন্তুকের দিকে। - 'মা, কাকে নিয়ে এসেছি দেখ!!' পুনরায় আবেগ-বিহ্বল স্বরে সুনির্মল বললো কথাটি।

রত্নাদেবী উৎফুল্ল স্বরে বললেন : "এ যে দেখছি, আমাদের পারভেজ!! এ্যাদিন কোথায় ছিলি বাবা? আয়-আয় বারান্দায় উঠে আয়।"

পারভেজ হাসি-হাসি মুখ করে দাঁড়িয়েছিল আঙ্গিনায়। সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে এলো। সুনির্মলের মা-বাবাকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করলো : "আপনারা কেমন আছেন?" - "আমরা তো ভালো আছি, তোমার খবর কি? এ্যাদ্দিন ছিলে কোথায়? আজকাল

কি করছো শুনি।" অমিতাভ বাবু একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন করে বসলেন। সবই মনের আবেগে। বেশ বোঝা গেল, ওনারা পারভেজকে খুব ভালোবাসেন। শুধু একজনই শুধু নিরব দর্শক। সে সুতপা। সুনির্মলের ডিভোর্সী বোন। পারভেজও ওকে কোনো কথা বললো না। কথা না বললে কি হবে? মনের মধ্যে অনেক বিরহের ঝড় বয়ে গেল। পুরাতন অনেক স্মৃতি, রঙ্গীন মধুময় স্বপ্নগুলো এক লহমায় দু'জনের মনের বেলা-ভূমিতে আছড়ে পড়ে ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকলো। সুতপা নিরব দৃষ্টিতে অপলক চেয়েছিল পারভেজের দিকে। সে শুধু ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি দিয়ে বোঝাতে চাইলো, আমি ফিরে এসেছি, প্রিয়তমা।

পারভেজ একটু আনমনা হয়ে পড়েছিল, ক্ষণিকের জন্য। সম্বিৎ ফিরে পেতে, লজ্জিত স্বরে বললো:

- "আমি বি.ডি.ও হয়ে আপনাদের ব্লকেই পোস্টেড কাকাবাবু।" - "তাই নাকি। বাহ্, শুনে খুব খুশী হোলাম বাবা। আশা করি এবার নিয়মিত দেখা সাক্ষাৎ হবে। শুনছো রমা, আমাদের পারভেজ এখন খুব বড়ো হয়ে গেছে। ছেলেটা অনেকদিন পরে এলো, একটু মিষ্টি মুখ করাও ওকে।" অমিতাভবাবু হাসি মুখে বললেন। রত্নাদেবী রান্নাঘরের দিকে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে একপ্রকার ছুটলেন। সুতপা সুযোগ পেয়ে দাদার উদ্দেশ্যে বললো - "তোর বন্ধুকে ঘরে যা না দাদা" -

— "চল ঘরে চল পারভেজ।" সুনির্মল বললো।

পারভেজ বাধা দিয়ে বললো - "না থাক, বারান্দায় বসি বরং। কাছাকাছি দুটো চেয়ার পাতা ছিলো। একটা চেয়ার টেনে সে বসলো। অন্যটায় সুনির্মল আসন করলো। সুতপা দাঁড়িয়েছিল। রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল, মাকে সাহায্য করতে। " কিছুক্ষণ পরে, চা-মিষ্টি নিয়ে মা-মেয়ে হাজির। রত্নাদেবী চায়ের চাপ-প্লেটটি পারভেজের

দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন — "নাও, একটু মিষ্টি মুখ করো বাবা।" সুতপা জলের গ্লাসটি

একটা ছোট্ট টেবিলের উপরে রাখলো।

ওরা চা খাচ্ছিলো, এমন সময় সুনির্মলের ঠাকুমা বুড়ি ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়ে এলে, কাঁপা কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন – "কে এসেছে রে, সুতি?"

– "আমি পারভেজ। আমাকে চিনতে পারছেন ?" নিজেই উত্তর দিল পারভেজ। প্রত্যুত্তরে ঠাকমা বললেন – 'আমি চায়ে চিনি খাইনা। তোমরা খাও।" তাঁর কথা শুনে সবাই হেসে উঠলো।

সুতপা হেসে বললো – "ঠাকমার বয়েস হয়েছে, উনি এখন একটু কানে কম শোনেন।" বুড়ি ঝাঁঝিয়ে ওঠেন; – "আমি কম শুনি না তোরা কম শুনিসরে? ঠাকমার এখন বয়েস হয়েছে, উনি এখন কানে কম শোনেন।।" কথাটি পুনরাবৃত্তি করে ঠাকমা যেমন মুখ ভোলেন তাই দেখে, সুতপা বহুদিন পরে একটু প্রাণ খুলে হাসলো। ঠাকমা গুঁড়ি গুঁড়ি চলে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এসে পারভেজের হাতে পুজোর প্রসাদ নকুলদানা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "নাও বাবা, তোমরা ঠাকুরের প্রসাদ খাও। সুতি তোরাও নে।" উনি আমাদের প্রত্যেককে প্রসাদ দিলেন। পারভেজ ঠাকমার চরণ ছুঁয়ে প্রণাম করলো। উনি আশীর্বাদ করলেন, তারপর ধীরে, ধীরে প্রস্থান করলেন। সুনির্মল চোখের ইশারায় পারভেজকে

বললো – "বুড়ি তোকে চিনতে পারেনি, বুঝলি ?" -"কেন পারবেনা? আমি তো আমার নাম বললাম ঠাকমাকে".

- "তবে ঠিকমত শুনতে পায়নি মনে হয়।' কথাটি বলে সুনির্মল মাথা চুলকোতে লাগলো। সুতপা বললো – "মানুষ কি সবসময় এক থাকে। উনি এখন টিভি দেখেন। অনেক বদলেছেন।"

- "যাক্, ও কথা। আমাকে কথা দে এবার থেকে তুই আমাদের বাড়ি নিয়মিত আসবি তো। ঠিক আগের মত। আসবি, আমরা খুব আনন্দ পাব।"

সুনির্মল আবেগের সুরে কথাটি বললো। পারভেজ বললো – "আসব। তোদের

উপকার কখনো ভুলতে পারি?" তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে সুতপাকে প্রশ্ন করে বসলো পারভেজ - "সুতপা তোমার বিয়ের খবর শুনেছিলাম কিন্তু ..... সুনির্মল প্রত্যুত্তরে বললো – "ঠিকই শুনেছিলি। ওর বিয়ে হয়েছিল। ছেলেটি চরিত্রহীন। মাতাল। ওরা আমাদের সব তথ্য গোপন করেছিল। সুতপার সঙ্গে বনিবনা হয়নি। সুতরাং, ডির্ভোর্সটা অনিবার্য ছিল।"

পারভেজ গম্ভীরভাবে বললো – "একদম ঠিক করেছিস। এভাবে অশান্তির মধ্যে সারাজীবন অ্যাডজাস্ট করে চলা যন্ত্রণাদায়ক। ভবিষ্যতে আরো ভয়ংকর কিছু ঘটনা ঘট যেতে পারত। অসম্ভব কিছু ছিল না। যাক্, ভালোই হয়েছে। ... তো এখন কি করছো তুমি।"

- "একটি স্কুলে ঢুকেছি।" সুতপা লাজুক সুরে কথাটি বললো। - "বাহ্। খুব ভালো খবর। শিক্ষার জগৎ মানে আলোর জগতে প্রবেশ।"

পারভেজ কৌতুক স্বরে কথাটি বলে সুতপার দিকে চাইলো ভালোভাসার দৃষ্টি নিয়ে। সুতপার চোখেও ঝিলিক দিলো ভালোবাসার মোহ। ওরা পুরনো স্মৃতিতে ফিরে গেল ...

পারভেজের সাংসারিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিলো না। বাবার সামান্য একটা ব্যবসা ছিলো। সে সুনির্মলের বন্ধু হবার সুবাদে, অমিতাভবাবু ওর পড়ালেখার দায়িত্ব নেন। অমিতাভবাবু একজন স্কুল শিক্ষক ছিলেন। পারভেজ নিয়মিত পড়তে আসত সুতপাদের বাড়ি। সেই থেকে ওর সঙ্গে পারিবারিক একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পারভেজ ছেলেটি মেধাবী ছিল। বরাবর এবং সৎ প্রকৃতির। আর সে জন্যই ওকে সবাই ভালোবাসত। রমাদেবী পারভেজকে নিজের ছেলের মতন যত্ন করে খাওয়াতেন প্রায় দিন। এরপর পারভেজ স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে কলেজে প্রবেশ করে। তখন আসা-যাওয়াটা একটু কম হয়।

সুতপাও যৌবনে পদার্পণ করে। একদিনকার ঘটনা। সুতপা রাত্রে টিউশান পড়ে বাড়ি ফিরছিলো একাকী। বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে, একটা পুকুরপাড়ে কয়েকটি ছেলে ওর পথ আটকিয়ে অসভ্যতা করছিলো। জায়গাটা নির্জন। ঝোপ-জঙ্গলে ভরা। সুতপার চিৎকার কারো কানে যায়নি। ঠিক সময়ে যদি পারভেজ না পৌঁছুতো, কি যে হতো – ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। সে সাইকেল চালিয়ে ঐ পথেই আসছিল সুনির্মলের সঙ্গে দেখা করতে। হঠাৎ সুতপার চিৎকার শুনে থমকে দাঁড়ায়। ওকে শয়তানদের হাত থেকে রক্ষা করতে এগিয়ে যায়। রক্ষা করেছিল ঠিকই, কিন্তু দুষ্কৃতিদের ছুরিতে পারভেজ ভীষণভাবে আহত হয়। রক্তাক্ত অবস্থায়, ওকে স্থানীয় হসপিটালে ভর্তি করতে হয়। — এই ঘটনার পর থেকে সুনির্মলের মা-বাবার আরো বিশ্বাসী পাত্র হয়ে ওঠে সে। সুতপাও একদিন মন দিয়ে বসে। কিন্তু পারভেজ ওকে ভালোবাসলেও বেশীদূর এগোতে পারেনি - নিজের সংসারের কথা ভেবে। তারপর সুতপার একদিন বিয়ে হয়ে যায়।

পারভেজ তখন সবে চাকরিতে ঢুকেছে। সুতপার বিয়ের সংবাদ শুনে মনে খুব দুঃখ পায়। হা-পিত্যেশ ছাড়া কিছু করার ছিলো না।

তারপর বহুদিন পরে আবার ওদের দেখা। পারভেজ এখনও বিয়ে থা করেনি। মাথার ওপরে দুটো দিদির বিয়ে হয়েছে। এখন সে মুক্ত। পাখা মেলে আকাশে ওড়ার স্বপ্ন দেখে। সুনির্মল, সে-ও বোনের কথা ভেবে, বিয়ে করেনি। সুতপাকে ভালো পাত্রের হাতে তুলে দিয়ে মুক্ত হতে চায়। সেই ব্যাপারে সুনির্মল কথা বলছিল পারভেজের সঙ্গে, বলছিল -"তুই একটা পাত্র দ্যাখ এবারে। আমরা তো ঠকেছি।"

-"অবশ্যই দেখব। তুই চিন্তা করিসনা।" পারভেজ কথাটা বলে সুতপার দিকে তাকিয়ে হাসলো। তারপর আঙুল ফাঁক করে 'ভিক্টর'র ইঙ্গিত দিল সে। মুখে দু'জনের হাসি। ওরা জুটি বেঁধে মুক্ত ঝলমল আকাশে পাখি হয়ে উড়ে যেতে চায়। মা রমা দেবী রান্নাঘর থেকে সব দেখে ফেলেছেন। মনে, মনে তিনি খুব খুশী। পারভেজ মন্দ পাত্র নয়। এখন ওদের সংসারের অনেক উন্নতি। গাড়ি-বাড়ি হয়েছে। বাবার ব্যবসাটা লোকে দেখে। সামাজিক সম্মান প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং, মেয়ের সুখের কথা ভেবে, পথের কাঁটা হতে চান না। রমাদেবী খুশী মনে এগিয়ে এসে মেয়ের কান ধরে বলেন, "পারভেজকে খেয়ে যেতে বলেছ? সেকথাটা আমাকেই বলতে হবে? বাবা, আজ আমাদের বাড়িতে তোকে খেয়ে যেতে হবে, ছাড়ছিনা কিন্তু।" পারভেজ হেসে সম্মতি দিল। অলক্ষ্যে কেউ কী হাসল? কি জানি।

***

## *** উপলব্ধি ***

মাঝে মাঝে মনে হয় আমি ভুল তুমি ঠিক, তুমি সকলের জন্য। আমি আমার একার ভাবতে পারিনা, তুমি সকলের। আমার একার ভাবা অন্যায়। তুমি সকলের জন্য। সকলের সাথে থেকো, সকলের মধ্যে থেকো তাতেই তোমার মন ভালো থাকবে। আমি তো তোমাকে ভালো রাখতে পারিনি, পারবোও না, তাই তুমি সকলের সাথে থেকো। আমার কাছে তোমার ভালো থাকাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যেভাবে ই হোক। তুমি ভালো থাকলেই আমি খুশি। তোমাকে সকলের জন্য ছেড়ে দিলাম, আমিও তাদের সকলের মধ্যে একজন হয়ে রইলাম।

এমন মনে হয় কিন্তু মানতে পারি না কেন জানি না, এবার থেকে চেষ্টা করবো, এটা মেনে নেওয়া, যে তুমি আমার একার হতে পারো না তুমি সকলের। যে তোমাকে ভালোবাসি কথাটা বলে ভালো থাকে থাকুক, তোমাকে ভালোবেসে যে সুখী হতে চায় হোক।

আমি আর বাধা দেবো না,

যদি বাধা দিই, তবে আর পাঁচটি সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমার তফাৎ কোথায়! আমি তো কারও সঙ্গে আমার তুলনা করতে চাই না। আমি আমার মতো। তুমি দয়া করে কাউকে আমার ছবি দেখিও না, যে আমার ছবি দেখতে চাইবে, তুমি তাকে বলবে যে সে বলেছে আমি তার একার নই, আমি সকলের তাই, সবাই যেমন সেও ঠিক তেমনি। তার বেশি কিছু নয়, বিশেষ কিছু নয়, তাই তার ছবি দেখতে চাইবে না কেউ।

-অন্তঃসলিলা

***

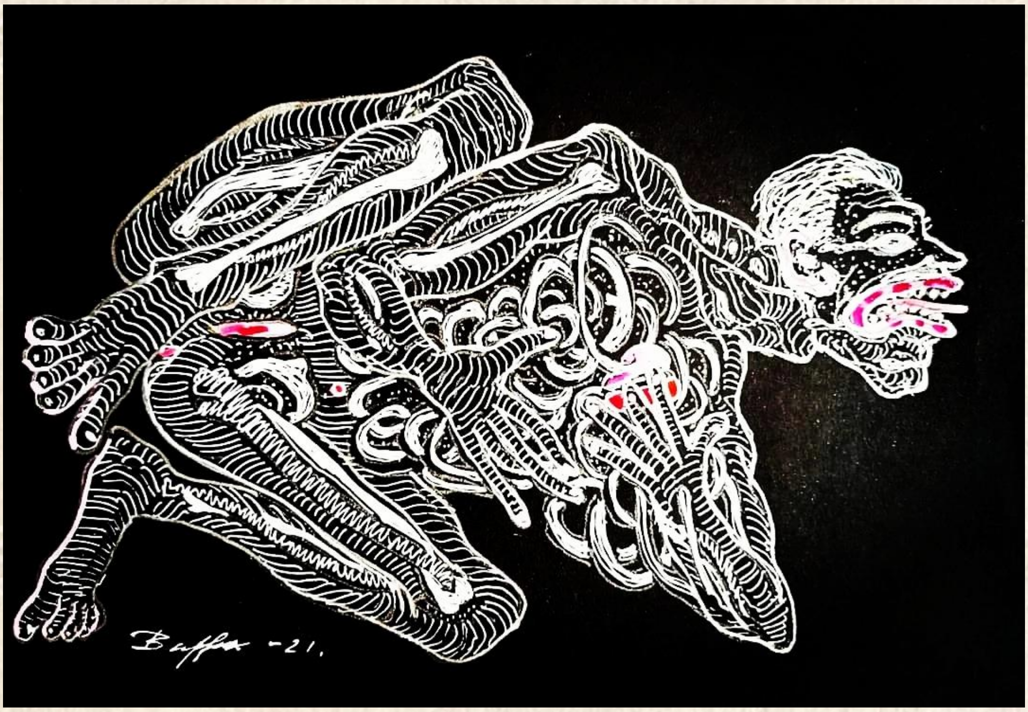

--বাপ্পা ভৌমিক

# সঙ্গী

## কণিকা সরকার

বিশ্বদেব চট্টোপাধ্যায়। পেশায় অধ্যাপক। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। দীর্ঘদিন কলেজের অধ্যক্ষের পদ সামলেছেন। পড়াশোনা, লেখালেখি নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। একের পর এক বই লেখেন। অনার্স, এম.এ-র সহযোগী বই হিসাবে বাজারে সেগুলোর দারুণ সুখ্যাতি! চিরকালই তিনি পড়াশোনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন, সঙ্গে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজকে। তাঁর কাজের জন্য পরিবারের কাউকে তিনি বিরক্ত করতে চান না। তাই পৃথক থেকেছেন অবসরের আগে পর্যন্ত।

দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে পড়াশোনা করেছেন। সুব্যবহার আর মনোযোগী ছাত্র হওয়ার সুবাদে সকলেরই প্রিয় ছিলেন। নিজে ছাত্র পড়িয়ে পড়ার খরচ জোগাড় করেছেন। কলেজে চাকরি পাওয়ার পর তাঁর অবস্থার উন্নতি হয়। সেই ছেলেবেলা থেকেই পড়াশোনার প্রতি তাঁর একাগ্রতা।

পরিবারে আছে তাঁর স্ত্রী এবং মেয়ে। মাঝে মধ্যে, অনুষ্ঠান-উৎসবে কলেজে নিয়ে গিয়েছেন তাদের। কোনও আত্মীয়-পরিজন বাড়িতে আসার খবর পেলে তাদেরও কলেজে আসার আমন্ত্রণ জানাতেন। কলেজই ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান-নেশা। সপ্তাহ শেষে, কখনও বা দু-সপ্তাহ পর তিনি পরিবারের সঙ্গে মিলিত হতেন। সংসারের দায়-দায়িত্ব সামলাতেন স্ত্রী, মালবিকা। অতিথিদের আপ্যায়ন করা --- কে কী খেতে পছন্দ করে, সেইমত রান্না করা, তাদের নিয়ে কোথাও না কোথাও বেরিয়ে আসা, যাবতীয়! পুজো বা অনুষ্ঠানে কাকে কী দিতে হবে, তার কেনাকাটা তিনিই করেন। বাড়ি ঘরের যে কোন সমস্যায় তদ্বির তদারক করা, লোক ডেকে পাঠানো, তাঁকেই করতে হয়। তিনি মনে করেন, বিশ্বদেব যা চায়, শান্তিমনে করুক! ও যে বইপাগল! তাই তাকে সংসারের কোন ঝামেলায় জড়াতে চাননি। ঘরে বাইরে একাই তিনি লড়াই করে গিয়েছেন।

অবসর জীবনে বছরে দু-বার সপরিবার একদিনের ভ্রমণ সারেন। তবে দুর্গাপুজোর দিন ক'টা বৃহৎ যৌথ পরিবারের মধ্যে কাটান! বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সরস জমাটি আড্ডাও দেন মাঝে মাঝে। তবে লেখাপড়ার ব্যাপারে তিনি এতটাই আপোষহীন, যে তাঁর ভালোবাসার মানুষগুলোর কাছ থেকেও দূরে সরিয়ে রাখেন নিজেকে। কারও সংস্পর্শই তিনি পছন্দ করেন না। মুখের চেহারায় কাঠিন্য ফুটে ওঠে। উষ্ণতা প্রকাশ পায় কথায়। অবসর জীবনেও তার ব্যতিক্রম কিছু নেই।

এক মেয়ে, ঝাঁপি, ইঞ্জিনিয়ার। বিশ্বদেব চেয়েছিলেন সে ডাক্তার, শিক্ষক হোক কিম্বা অধ্যাপনা করুক। তা সত্ত্বেও মেয়ে যখন বি.টেক করল, তখন তিনি বললেন, এম.টেক করে পি.এইচ.ডি করতে। যাতে কোনও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যাপনা করা যায়! ঝাঁপি এম.টেক করলেও অধ্যাপনার পথে পা বাড়াল না। মেয়ের সাথে মনোমালিন্য ঘটল। আসলে সেও তো বাবাকে খুব কাছে কখনও পায়নি! বাবার সঙ্গে সময় কাটানো, আহ্লাদ-আব্দারে খুনসুটি করা, কিছুই যে সে পায়নি। তাই বাবাকে বোঝার ক্ষেত্রে তার বিস্তর ফাঁক রয়ে গিয়েছিল। কী আর হয়! বিশ্বদেব কিন্তু নিজের ত্রুটি দেখেন না এ সব বিষয়ে।

ম্যাট্রিমনিতে এক পাত্রের সঙ্গে যোগাযোগ হল ঝাঁপির। ব্যাঙ্গালোরে থাকে। সে-ও ইঞ্জিনিয়ার। ও তাকেই পছন্দ করল। বিয়েও হল যোগাযোগের বছরখানেকের মধ্যে। মেয়ের বিয়েতে আপ্যায়ন, নিমন্ত্রণ, আচার-অনুষ্ঠান সবেতেই তিনি সক্রিয় ছিলেন।

তিনি চাননি, একমাত্র মেয়ে বলে নিজের অধিকারে রাখতে। অবশ্য চাইলে যে পারতেন না, তেমন নয়! একমাত্র মেয়ে, সব কাজেই তাঁর বিপরীতে গেছে। তাঁর প্রভাব খাটেনি কোথাও। তবু বাবা হিসাবে অধিকার ফলাতে চাননি। হয়ত' স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে চান না!

ব্যাঙ্গালোরে চলে গেছে মেয়ে-জামাই, এমনকি ওর শ্বশুর-শাশুড়িও। পাঁচ বছর হল। মায়ের সাথে ঝাঁপির নিয়মিত কথা হয়। কিন্তু বিশ্বদেব চান না বেশি কথা বলতে। ওদের বছর দুয়েকের বাচ্চাটাকে এখনও বিশ্বদেব চোখে দেখেননি। যা দেখেছেন ভিডিও কলিং-এর সৌজন্যে। স্ত্রী-ও তাঁকে বেশি ডাকাডাকি করেন না। নিজেই সামলে নেবার চেষ্টা করেন যত দায়ভার! তাঁকে ছেড়ে দু' রাত্রি কোথাও থাকার কথা ভাবতে পারেন না। সারাদিনে মানুষটার চা, জলখাবার, ভাত-রুটি --- যা যা মানুষটা এককালে পছন্দ করত বা এখনও করে, জোগাড় করতেই তিনি ব্যস্ত থাকেন! বাক্যালাপ তেমন নাই বা থাক! বিশ্বদেব সারারাত্রি পড়াশোনার পর ভোরবেলা নিজেই চা করেন। খান। তারপর ঘুমোতে যান। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা এর অন্যথা হয় না। বেলা দশটার দিকে ওঠেন। জলখাবার খান। নিজেরই, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণে কোনো কোনো দিন বাইরে বেরোন। নইলে আবার বই নিয়ে বসে যান।

অবসরের পর একটা কাজে তিনি মন দিয়েছেন, ঠাকুর গোপালের সেবা। স্ত্রীকে সে দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন। সে কাজ করতে তাঁর দু'ঘণ্টা সময় কাটে। দুপুরের খাবার খেতে সময় গড়িয়ে যায় বিকালের দিকে। রাতেও, খাবার খেতে খেতে প্রতিদিনই বারোটা বেজে যায়। বই ছাড়া যখনই তিনি বসেন, তখন গান শোনেন, নিবিষ্ট মনে। রবীন্দ্রসংগীত। তার বাইরে হলে কীর্তন। এই বিষয়ে কখনও আলোচনা করেন স্ত্রীর সাথে! বাছা কিছু শিল্পী আছেন, তাদেরই গান শোনেন।

বিশ্বদেবের পছন্দের মানুষ আরও একজন, তাঁর ভাগ্নী, অনুশা। ভালোবাসেন। অনুশা এলে বাড়িতে গানের আসর বসান। বন্ধু, প্রিয়জন, শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে আত্মীয়জনদের ডেকে পাঠান। তিনি বিশ্বাস করেন, অনুশা তাঁকে পছন্দ করে, শ্রদ্ধা করে। সম্পূর্ণ একা, একটা মেয়ে লড়াই করে নিজেকে দাঁড় করিয়েছে। সময় সুযোগ পেলে আসে, একাই। মামাকে সে কোনও অবস্থাতেই বিরক্ত করতে চায় না। কেউ সঙ্গে এলে মামাকে তাদের আপ্যায়ন করতে হবে, সঙ্গ দিতে হবে, তাতে মামার পড়াশোনায় ফাঁক পড়বে। অবশ্য পারিবারিক যে কোন অনুষ্ঠানে সবাই সপরিবারে কাটায় ক'টা দিন!

অনিয়মিত জীবন যাপন দেখে অনুশা বিশ্বদেবকে বলেছিল, 'বয়স হয়েছে তো! খাবার-দাবারটা নিয়মমত করো! দিনে দেড়টা থেকে দুটো আর রাতে দশটার বেশি করবে না রাতের খাবার খেতে! পড়াশোনা করবে কী করে নয়ত' ? '

অনুশাই একমাত্র পড়াশোনার ব্যাপারে তেরচা করে কথা বলে না বিশ্বদেবকে। শিশুর মত বিগলিত হেসে বলেছিলেন, 'সেই তো আমার প্রাণ রে! তোদের গান আছে, নাটক আছে, টিভি সিরিয়াল, রিয়্যালিটি সো, কত কী আছে, আমার যে ওটাই আছে! পড়াশোনার জন্য আমি সব ছাড়তে পারি!'

'জানি তো! তাই না বলছি, ঠিক ঠিক সময়ে খাওয়াদাওয়া করো!'

দুজনে কাছাকাছি, অথচ একাকী! বিড়ম্বনাময় জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন বিশ্বদেবের স্ত্রী মালবিকা। বই মুখে করে সময় কাটাতে মোটেও ভাল লাগে না। প্রাত্যহিক নিয়মে ভাই-বোন, মেয়ে-জামাইয়ের খোঁজ নেন ফোনে। সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন রকমের রান্না দেখে, তা খাতায় টুকে রাখেন। বিভিন্ন রকমের সেলাই-ফোঁড়াইয়েও তার আগ্রহ। আগে বহুরকমের কাজ করেছেন।

ইদানীং পারেন না। চোখটা জানান দেয়, বয়স হয়েছে! তবু ভালোবাসার টানে সেগুলো দেখতে থাকেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা আবৃত্তিগুলো শোনেন। পারিবারিক অনুষ্ঠানে সেগুলো পরিবেশন করেন। কখনও বা গান শুনেই সময় কেটে যায়। আশেপাশের ফ্ল্যাটের মানুষজনকে আপ্যায়ন করেও কিছুটা সময় যায়!

মহামারীর প্রকোপে সকলের সাথেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে, সকল পরিবারই। ফোনে ফোনে যতটুকু হয়! কেউ কারও পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর নেই! লকডাউনের নিয়মকানুন শিথিল হতেই অনুশা এসেছিল বিশ্বদেবের কাছে। সঙ্গে বছর আটেকের এক দস্যি মেয়ে! নিজেরও হাঁফ ধরা ভাব কাটাতে, মেয়েরও একঘেয়েমি দূর করতে!

বাড়ি থেকে বেরোবার আগে দস্যিমেয়েকে সাবধান করে দিয়েছিল অনুশা, 'দাদুর পড়ায় যেন ব্যাঘাত না ঘটে!' দস্যিটা অবশ্য এর আগে দু-একবার যা এসেছে, তাতে দাদুকে বলেছে, 'তোমার তো দুটো কাজ, বইপড়া আর বিড়ি খাওয়া!' যদিও বিশ্বদেব বিড়ির ধোঁয়া টানেন না! উনি সিগারেটেই অভ্যস্ত। ছাইদানিটা পরিষ্কার করতে করতে পাকা গিন্নির মত বকবক করে। কখনও বা দেশলাই, সিগারেটের প্যাকেট লুকিয়ে রাখে। মামা যাতে বিরক্ত না হন, টের পেতেই অনুশা খুঁজে এনে মামাকে ফিরিয়ে দেয় সেসব।

সেই দস্যিকে পেয়ে মালবিকা বিশ্বদেবের খুশির সীমা রইল না। অন্যান্য ফ্ল্যাটের মানুষজনও আগের মতই ওকে নিয়ে মেতে উঠল। কেউ কেউ রসিকতা করে বলল, 'এবার তো মেয়ে অনেক বড় হয়ে গেছে অনুশা! আর কেন দেরী? বিয়ে দিয়ে দাও!'

রসিকতার উত্তরে সে দস্যিমেয়ে বলল, 'মা বলেছে, লেখাপড়া শিখে বড় হয়ে তবে বিয়ে! আমি তো এখন ছোট!'

ওদিক থেকে কেউ বললেন, 'ভালোই তো, দাদুই পড়া শিখিয়ে নেবে! এত ভালো পাত্র যখন ঘরেই আছে! কী ভাবছ অনুশা?'

দস্যিটা অমনি ফোঁস করে বলে উঠল, 'এই দাদুকে বিয়ে? কক্ষনো না! সারাদিন শুধু বই পড়ে! জানোই তো, পড়াশোনা আমার ভাল্লাগে না! তাছাড়া দাদু ওসব পড়া জানে না। আমাকে শেখাতেও পারবে না।'

সকলেই ওর কথায় হেসে উঠল। একজন বলল, 'তাই নাকি!'

'নয়ত' কী! জানে নাকি, 'ছায়ার ঘোমটা মুখে টানি' ছড়া? 'আমাদের ছোট নদী'-ও জানে না।'

অনুশা চোখ দেখিয়ে, চড় দেখিয়ে, বকেও ক্ষান্ত করতে পারছে না মেয়েকে। মালবিকা বলল, 'দেখোই না! ও তো বাচ্চা! বুঝলে কি আর বলত?'

সত্যিই তো, একজন বাংলা সাহিত্য বিষয়ের অধ্যাপক, গবেষক সম্পর্কে এ কথা কি মেনে নেওয়া যায়! মেয়েও মাকে মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, 'নাতো কী? সেদিনই তো বলল, ও আমি জানি না দাদু, তুমি আমায় শিখিয়ে দাও! তখন শুনলে না নাকি!'

তিতলির হাব-ভাব-কায়দায় সকলেই হেসে কুটিপাটি। দাদু বইগুলো সব ছড়িয়ে ছড়িয়ে রাখে, ও গুছায়। দাদু যেখানে সেখানে বই রেখে দেয়। ও সেগুলো দাদুর ঘরে রেখে আসে। দাদু যখন গোপালের পুজো করে তখন দাদুর পাশে বসে দেখে। গোপালের গল্প শোনে। দাদু বলেছে, গোপালের সাথে তিতলিকে নিয়ে দাদুর রোজ কথা হয়! কী কথা হয়, তাই ও মন দিয়ে শোনে। দাদু একমনে পড়া করছে দেখলেই বিকৃত সুরে 'দা-দু--' বলে এমন ডেকে ওঠে, চমকে যাবার ব্যাপার! অনুশা নিষেধ করেছে কতবার! শোনেনি। বলে কী, 'দাদুকে ডাকছি তো!'

মন দিয়ে পড়তে পারছে না মানুষটা! ব্যাঘাত ঘটছে। কখনও কখনও বিরক্তও হচ্ছে! জোর গলায় তিতলিকে সরেও আসতে বলছে। ভেতর থেকে দরজা লাগিয়ে পড়ার ব্যবস্থা করছে। এই সব কারণে অনুশা চলে যেতে চাইলেও মালবিকা আটকাচ্ছে, 'কতদিন পর এসেছ, আবার যে কবে আসবে! তাছাড়া তিতলি তো আসে না বারবার তোমার সাথে!'

'মামীমা, দেখছ তো, কেমন দুষ্টু ও! মামার তো ভালো লাগছে না, না!'

'সে-ই! সারাজীবন এক থেকে গেল! বেশি বলতে গেলে বুড়ো বয়সে আবার বাড়ি ছেড়ে আলাদা থাকার চেষ্টা করবে!'

এমনি করে দিন দশেক পেরিয়ে গেল। পরদিন ভোরের ট্রেনে বাড়ির দিকে রওনা দিল অনুশা। বিশ্বদেব প্রতিবার স্টেশনে আসেন, কিন্তু এবার এলেন না। অনুশা নিজেও চায়নি। উনিও কোনওবারই অনুশার আপত্তি শোনেন না, স্টেশনে তুলতে আসেন। এবার 'সাবধানে যাস!' বলে ঘরে ঢুকে পড়লেন। মালবিকার চোখ ছলছল করে উঠল। ওদের ছেড়ে দিতে মন যে চাইছিল না!

বাড়ি পৌঁছে অনুশা ফোন করেছিল। নিস্পৃহের মত, দায়সারা ভাবে অনুশার কথার উত্তর দিয়েছিলেন বিশ্বদেব। কোনও রকম উষ্ণতা ছিল না তাতে। অনুশা মনে মনে মরে যাচ্ছিল। 'মেয়েটা যে কী দুষ্টু হচ্ছে! ছি ছি ছি, মানুষটা কী যে বিরক্ত হয়েছে, বলার না! এ মেয়েকে নিয়ে এবার ঘরে থাকাই ভাল!

দু'দিন পর। হঠাৎ বিশ্বদেবের ফোন দেখে চমকে উঠল অনুশা। মালবিকার শরীর ভালো ছিল না, বিভিন্ন সমস্যা, বাড়াবাড়ি কিছু হল না কি! হাতের কাজ ফেলে ফোনটা ধরতেই বিশ্বদেব বললেন, 'বদমাসটা কী করছে রে? দে তো ওকে ফোনটা! একটু কথা বলি!'

অনুশা অবাক। একে এই তো এল, এত তাড়াতাড়ি ফোন! তারপর যার কাণ্ডকারখানায় তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছিল মানুষটা, তার সঙ্গেই এখন কথা বলতে চাইছে!

'মামা, সে তো ঘরে নেই! আঁকার ক্লাসে দিয়ে এলাম একটু আগে!'

'ও!' বিমর্ষ স্বরে বলেই থেমে গেলেন। এর পরেই মালবিকার গলা, 'আরে, তোমরা যাওয়ার পর থেকে শুধুই এদিক ওদিক ঘুরছে আর টেবিলে এসে বসছে! পড়াশোনায় বসতে পারছে না। জীবনে এই প্রথম, পড়া ছেড়ে ঘুরছে! সিগারেট ধরিয়ে খানিক

পরেই রেখে দিচ্ছে! গোপাল পুজোতেও মন নেই। কী যে হয়েছে! বলছে, 'ঘরটা ফাঁকা হয়ে গেল কেমন, না! বইগুলো গুছিয়ে রেখেছিল দ্যাখো! বদমাসটার গলা কানে যেন বাজছে খালি!'

অনুশার বুকের ভেতর জমে থাকা অপরাধবোধ ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল। বলল, 'ও এলেই ফোন করছি আমি, কেমন!'

অনুশা ভাবছিল, প্রাণের বেহায়াপনার কত জোর, অন্ধ খনির নিটোল পাথরেও রসের সঞ্চার ঘটায়!

# আমি ও পুরুষ

## অনিকেত দেবনাথ

পড়ন্ত বিকেলের সূর্যের লাল আভাকে বিবর্ণ করে কালো মেঘের চাদরে ঢেকেছে আকাশ। এই কিছুক্ষণ আগেও নীল আকাশের গালে ভালোবাসার লাল আভা ফেলেছিল সূর্যের নরম আলো। কিন্তু এক লহমায় কেউ যেন কেড়ে নিয়েছে আকাশের সমস্ত খুশির মুহূর্ত। কিছুক্ষণের মধ্যেই মেঘের চাদরের বাঁধ ভেঙে ঝোড়ে পড়বে অবাধ্য বৃষ্টির অগুনতি ফোটাগুলি। আকাশের শত বাধা মানতে নারাজ তারা।

এই বৃষ্টির ফোটাগুলির মতই অবাধ্য হয়ে উঠছে নীলাদ্রির চোখের জল। নীলাদ্রির শত বাধা অমান্য করে ঝোড়ে পড়তে চাইছে তারা। ইতিমধ্যেই নীলাদ্রির গাল বেয়ে নেমে এসেছে কয়েক ফোটা বেলাগাম জলের বিন্দু। তবে ঘন্টা খানেক আগেও নীলাদ্রির চোখে ছিল স্বউজ্জ্বল দীপ্তি। নীলাদ্রির গাল অদৃশ্য রঙ তুলির লাল রঙের স্পর্শে রঙিন হয়ে উঠেছিল। নিজের ভালবাসার মানুষটাকে সে প্রথমবার নিজের মনের কথা বলতে যাচ্ছিল।

নীলাদ্রি ও রৌদ্রকের বন্ধুত্বের শুরু ঠিক কিভাবে তা ওরা নিজেরাও জানেনা। ছোটোবেলা থেকে একসঙ্গে বড় হয়েছে ওরা। একে অপরের প্রত্যেক ছোটো বড়ো মুহূর্তের সাক্ষী ওরা। ওদের মাঝে অবশ্য আরেকজন রয়েছে, তিয়াসা। তিয়াসার সঙ্গে ওদের পরিচয় স্কুলে। ওরা যখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়ছে তখন বাবার বদলির কারণে ওদের স্কুলে এসে ভর্তি হয় তিয়াসা। অল্প সময়ের ব্যবধানেই তিয়াসার সঙ্গে ওদের বন্ধুত্ব অটুট হয়ে ওঠে।

বর্তমানে ওরা ৩ জনেই সদ্য স্কুলের গন্ডি টপকে কলেজে উঠেছে। স্কুলে ৩ জনের একই বিভাগ থাকলেও কলেজে ওদের বিষয় আলাদা হয়েছে। রৌদ্রক ও তিয়াসার স্নাতক ডিগ্রির বিষয় রসায়ন। নীলাদ্রির বিষয় অঙ্ক। ফলে প্রকৃতির নিয়মেই ৩ অভিন্ন আত্মার মাঝে কোথাও যেন একটু দূরত্ব তৈরি হয়েছে ওদের অজান্তেই।

তবে এই দূরত্বকে পাত্তা দিতে নারাজ ওরা ৩ জনেই। কলেজ শেষে কলেজের ঠিক সামনে দিয়ে বয়ে চলা গঙ্গার ঘাটে জমে ওঠে ওদের আড্ডা। চলে সন্ধ্যা ঘনিয়ে যাওয়ার পর পর্যন্ত। ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপের সঙ্গে রৌদ্রকের গিটারের টুংটাং ও মন ভোলানো

গানে সময় ভেসে যায় গঙ্গার স্রোতের ন্যায়। তবে এরই মাঝে নীলাদ্রির মনে ভালোবাসার তার কতবার যে বেজে ওঠে ওরই সবচেয়ে কাছের মানুষটির প্রতি তা নিজেও গুনে শেষ করতে পারেনা নীলাদ্রি।

এই ভালোবাসার সূচনা বহু পূর্বেই, সেই স্কুল জীবন থেকে। তারপর থেকেই যত দিন বয়ে গিয়েছে ততই নীলাদ্রির মনে ভালবাসার গভীরতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে অপরদিকের মানুষটাকে বলে ওঠার মাঝে বন্ধুত্ব সবথেকে বড় বাঁধা হয়ে উঠেছে ওর কাছে। ওদের এত বছরের বন্ধুত্ব এক লহমায় ধূলিস্যাৎ হয়ে গেলে তা কখনই মেনে নিতে পারবেনা নীলাদ্রি।

এরই মধ্যে প্রকৃতির নিয়মে তৈরি হওয়া সেই সামান্য দূরত্ব ক্রমেই মাইল খানেক হয়ে উঠতে শুরু করে নীলাদ্রির কাছে। রৌণক এবং তিয়াসার সঙ্গে দূরত্ব বৃদ্ধি পেতে শুরু করে নীলাদ্রির। তবে নীলাদ্রির সঙ্গে যত দূরত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে রৌণক ও তিয়াসার, ততই কাছে আসতে শুরু করে ওরা একে অপরের। আগে গঙ্গার ঘাটের আড্ডায় নীলাদ্রি ছিল গল্পের কেন্দ্র বিন্দু। ওদের ২ জনকে ছাড়া কিভাবে ও কলেজে একঘেয়ে অঙ্কের ফর্মুলার মাঝে এতটা সময় কাটালো তা নিয়েই জমে উঠত ওদের আড্ডা। তবে সময়ের ব্যবধানে সেই আড্ডায় নীলাদ্রি শুধুই শ্রোতার ভূমিকা পালন করে। আড্ডার নয়া মোড়ে শুধুই রৌণক ও তিয়াসার খুনসুটি।

ক্রমেই সবকিছু বিরক্তিকর হতে থাকে নীলাদ্রির কাছে। রৌণক কি বুঝতে পারেনা ওর ভালোবাসার কথা? তারপরেও কিভাবে তিয়াসার সঙ্গে সম্পর্কে জড়াতে পারে রৌণক? এই প্রশ্নই বারবার ভেসে উঠতে থাকে নীলাদ্রির অবুঝ মনের অন্দরে।

নিজের 'ভালবাসার' সত্য ওদের দুজনকেই বলে দিতে চায় ওর মন। "ওরা কি ওকে বুঝবেনা?" – সবকিছু জানলে ওরা নিশ্চই ওর কথা বুঝবে। তবে নিজের মনের কথা মনেই দমিয়ে রাখতে হয় নীলাদ্রিকে। হাজারো দুশ্চিন্তার ভিড়ে নীলাদ্রির মনের গোপন সত্য যেন মনের মাঝেই লুকিয়ে পড়তে চায়।

এরই মধ্যে দুর্গাপুজোর ছুটিতে দার্জিলিং যাওয়ার পরিকল্পনা করে ফেলে রৌণক ও তিয়াসা। সন্ধ্যাকালীন এক আড্ডায় সেই কথা নীলাদ্রিকে জানায় ওরা। 'নীলাদ্রি ছাড়া ওরা যে দার্জিলিং যাওয়ার অনুমতিই পাবে না। তাই নীলাদ্রিকে যেতেই হবে'। ওদের যুক্তি নীলাদ্রির মনের ফাটল আরও বৃদ্ধি করে। ওদের মাঝে নিজের গুরুত্ব কোথায় তা খোঁজার চেষ্টাও ওর কাছে নিষ্ফল বলে মনে হয়। তবে নিজের ভালোবাসার তাগিদেই দার্জিলিং ভ্রমণে মত দেয় নীলাদ্রি।

দিন কয়েক বাদে দুর্গাপুজোর সপ্তমীর দিন সবুজ পাহাড়ে ঢাকা স্বপ্নভূমিতে পৌঁছে যায় ওরা। এতদিনের সমস্ত বিষাদ ভুলে মন ভাল হয়ে ওঠে নীলাদ্রিরও। তবে এই দার্জিলিংই যে ওর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবে তা হয়ত স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি নীলাদ্রি। দার্জিলিংয়ে পা দিয়েই নীলাদ্রি ঠিক করেছিল ওর মনের মানুষকে এই স্বপ্নভূমিতেই ও ওর মনের কথা বলবে। আর গোপন নয় এবার নিজের বাস্তবকে অন্তত সমাজের এই ২ টি মানুষের বাস্তবের সামনে তুলে ধরবে ও। সেইমত প্রথমদিন সকালেই অসুস্থতার

বাহানায় হোটেলে থেকে যায় নীলাদ্রি। নীলাদ্রিকে ছাড়াই ভ্রমণে বেরোয় রৌত্রিক ও তিয়াসা। বিকেলের মধ্যেই হোটেলে ফিরে আসবে ওরা। নীলাদ্রির হাতে কয়েক ঘন্টা মাত্র। সমস্ত পরিকল্পনা হোটেলে আসার সময় গাড়িতেই করে ফেলেছে নীলাদ্রি।

রৌত্রিক তিয়াসা বেরিয়ে গেলে হোটেলে বেশ তোড়জোড়ের সঙ্গে নিজের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মনোনিবেশ করে নীলাদ্রি। হোটেলের একটি ছেলেকে দিয়ে গোলাপের তোরা ও লাল হৃদয়ের বেলুনের প্যাকেট আনিয়ে নেয় ও। যদিও নীলাদ্রি জানে রৌত্রিক ও তিয়াসার ভালোবাসায় অনৈতিক ভাবে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করছে ও। তবে ও চায়ও না ওদের মধ্যে কোনও বাধা হয়ে দাঁড়াতে। ও শুধুমাত্র নিজের মনের কথা বলতে চায় ওর মনের মানুষকে। ওর জীবনের সবচেয়ে বড় সত্যি জানাতে চায় ও। এতদিনের একান্ত গোপনীয়তার পর্দা সরিয়ে ওর সবচেয়ে কাছের ২ জন মানুষের সঙ্গে ওর সত্যি ভাগ করে নিতে চায় ও।

সুন্দর ভাবে ঘর সাজিয়েছে নীলাদ্রি। ঘরের আনাচে কানাচে ভালোবাসার প্রতীক হিসাবে খেলে বেড়াচ্ছে লাল বেলুনের দল। নীলাদ্রির ভালোবাসার রঙ যেন মেখেছে নীল আকাশটাও। ডুবন্ত সূর্যের ভালোবাসার ছোঁয়ায় লাল হয়ে উঠছে আকাশের নীল শরীর। ঠিক যেমন লাল হয়ে উঠছে নীলাদ্রির গাল দুটো।

পাহাড়ের বুকে একান্ত সময় কাটিয়ে বেশ ভাল মনে হোটেলে ফিরেছে রৌত্রিক ও তিয়াসা। তবে হোটেলে ফিরে ঘরে প্রবেশ করেই হতবাক হয়ে যায় ওরা দু'জন। নীলাদ্রির হাতে গোলাপের তোরা। ঘর ভর্তি লাল বেলুন। রৌত্রিক এক মুহূর্তেই বুঝে নেয় নীলাদ্রি তিয়াসাকে ভালোবাসা জ্ঞাপন করতে চলেছে। বেশ বিরক্তি লাগতে শুরু করে ওর। ছোটোবেলা থেকে নীলাদ্রির ও সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু হলেও রৌত্রিক মনে মনে নীলাদ্রির প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল বরাবর। প্রথম থেকেই ক্লাসের সবচেয়ে ভাল ছেলের তকমা নীলাদ্রির জন্যই তোলা থাকত। রৌত্রিকের হাজার চেষ্টার পরও সবদিক থেকেই ক্লাসের সেরার তকমা ছিনিয়ে নিত নীলাদ্রি। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকেও রৌত্রিকের থেকে বেশ ভালো ফল করেছে নীলাদ্রি।

"এবার কি তবে তিয়াসাকেও ছিনিয়ে নিতে চায়……" , রৌত্রিকের ভাবনায় ছেদ পড়ল নীলাদ্রির কথায়।

"যেদিন থেকে এই মনে-শরীরে ভালোলাগার আকর্ষণ অনুভব করেছি সেদিন থেকেই তোকে আমার ভালোলাগতে শুরু করে। তবে কখনই তা বলে উঠতে পারিনি। কারণ আমি নিজেই দিশাহারা ছিলাম আমার ভালোলাগার বিষয়ে। যেই সময় তোর একাধিক প্রেম সেই সময় বিভ্রান্তের মত খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম আমার জীবনের সত্যিকে। পরে যখন আমার চোখের সামনে সত্যি উন্মোচন হয়। চুপ করে থাকতে বাধ্য হই আমি" । আর কিছু না বলে এক পা এক পা করে রৌত্রিক ও তিয়াসার দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করে নীলাদ্রি।

ততক্ষণে রৌত্রিকের রাগ মাথায় চড়েছে। কিছুতেই ও তিয়াসাকে ওর থেকে ছিনিয়ে নিতে দেবেনা নীলাদ্রিকে। তবে ওদের দুজনকে অবাক করে দিয়ে রৌত্রিকের সামনে গোলাপ নিয়ে বসে পরে নীলাদ্রি। রৌত্রিকের হাতে গোলাপটা তুলে দেয় ও।

"আমি তোকে ভালোবাসিরে, ভালোবাসি আমি তোকে" … নীলাদ্রির এহেন কান্ডে হতবাক রৌত্রিক। হাজারো প্রশ্ন ভিড় করে আসছে ওর মনে। তবে রৌত্রিককে প্রশ্ন করতে না দিয়ে রৌত্রিকের স্তম্ভিত চোখে চোখ রেখে ফের বলতে শুরু করে নীলাদ্রি, "হ্যা ঠিকই শুনেছিস আমি তোকে ভালোবাসি। আমি 'পুরুষপ্রেমী' । সেই ক্লাস নাইন থেকে তোকে আমার ভালোলাগতে শুরু করে। শুধু তুই নস যেকোনও সুদর্শন ছেলেই আমার মন কেড়ে নিতে থাকে। তুই বা অন্যরা যখন নতুন নতুন বান্ধবী বানাতে

ব্যস্ত আমার তখন বন্ধুদের শারীরিক বদলের দিকেই ছিল বেশি নজর। এক নিঃশ্বাসে কথা গুলো বলে একটু থামে নীলাদ্রি। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ফের বলতে শুরু করে ও, "তবে জানিস, আমি তখনও এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়াতাম, 'নারী নয় কেন?' তবে এর যখন উত্তর পেলাম তখন রঙিন এই সমাজের অন্ধকার মোড় গুলোও চোখের সামনে স্পষ্ট হতে শুরু করল। আমার সত্যিকে মনের অন্দরেই লুকিয়ে রাখলাম আমি। ফের একটু থামল নীলাদ্রি। ওর চোখের কোন থেকে দু'ফোঁটা জল লাল বেলুনের ওপর পড়ে রঙিন হয়ে উঠল।

তবে এবার আর নীলাদ্রিকে বলতে না দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল রৌদ্রিক "তুই তো জানিস আমি তিয়াসাকে ভালোবাসি। আর তুই 'গে' ? কাকু কাকিমা জানেন? তুই জানিস সবাই জানতে পারলে কি হবে?" – ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের স্বরে কথা গুলো বলল রৌদ্রিক।

তবে শান্ত স্বরেই উত্তর দিল নীলাদ্রি, - "দেখ আমি তোর আর তিয়াসার মাঝে কখনই আসতে চাইনা। তোরা আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু। এতদিন ধরে মনের মাঝে চেপে রাখা সত্যিটা কাউকে না বলতে পেরে হাপিয়ে উঠেছিলাম আমি। তাই আজ ভোরে দার্জিলিংয়ে পা দিয়েই নিজের মনের কথা তোদের ২ জনকে জানানোর সিদ্ধান্ত নি আমি। তবে দয়া করে এখনই কাউকে কিছু বলিস না তুই। আমি ভাবতে পারিনি তুই আমার সম্বন্ধে সব জানলে এতটা ঘৃণা করবি আমায়, জানলে আমি তোকে এই পরিস্থিতিতে ফেলতাম না" ।

নীলাদ্রি হয়ত আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, তবে ওর কথা শেষ না হতে দিয়েই গোলাপের তোড়াটা মেঝেতে ফেলে দিল রৌদ্রিক। রৌদ্রিকের বুটের চাপে লাল গোলাপের পাপড়ি গুলো কালো হয়ে গেল নীলাদ্রির চোখের সামনে।

"ছিঃ! তোর সঙ্গে থাকা মানে আমারও বদনাম। কালই আমরা ফেরার ফ্লাইট ধরব" ।- কথা শেষ করে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল রৌদ্রিক। এতক্ষণ নির্বাক সাক্ষী হয়ে দেখছিল তিয়াসা। এবার রৌদ্রিকের পেছন পেছন তিয়াসাও ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল। লক্ষাধিক আশঙ্কা মনে নিয়ে সদ্য ঘটে যাওয়া বাস্তব নাটকের রঙ্গমঞ্চে নিশ্চুপ বসে রইল নীলাদ্রি।

নীলাদ্রির মনের বিষণ্ণতার ছোঁয়া যেন প্রকৃতির মনেও আঘাত হানলো খানিকেই। ঘন কালো মেঘে ছেয়ে গিয়েছে আকাশ। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সবুজে ঘেরা দার্জিলিং বৃষ্টির চাঁদরে ঢেকে নেবে নিজেকে।

বাইরে অবাধে ঝোড়ছে জলের ধারা। তেমনি বাঁধাহীন গতিতে ঝোড়ে চলছে নীলাদ্রির চোখের জল। পাশের ঘরে রৌদ্রিককে কিছু বোঝাচ্ছে তিয়াসা। ও হয়তো বুঝতে পেরেছে নীলাদ্রির পরিস্থিতি। তবে রৌদ্রিকের তীব্র ঘৃণা ও তাচ্ছিল্লের সামনে তিয়াসার যুক্তির পথে বাধা হয়ে দাড়াচ্ছে ওর ভালোবাসা। বড্ড ঘুম পাচ্ছে নীলাদ্রির। হাজারো মানসিক চিন্তার ভাড়ে চোখ দুটো টেনে খুলে রাখতে পাড়ছেনা ও।

পরদিন ভোরে তিয়াসাকে নিয়ে আগেই ফ্লাইট ধরেছে রৌদ্রিক। দুজনের কেউই একবারও দেখা করতে আসেনি নীলাদ্রির সঙ্গে। নীলাদ্রির ঘুম ভাঙ্গলে হোটেল বয় ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছে ফ্লাইটের টিকিট। ওর ফ্লাইট বিকেলে।

সেইদিন সারাদিন কেমন যেন ঘোরের মধ্যে কেটেছে নীলাদ্রির। সকাল থেকে রৌত্রিক ও তিয়াসাতো দূরের কথা ওর বাবা-মাও একবারও ফোন করেনি ওকে।

“তবে কি?”, “রৌত্রিক কি কিছু বলেছে?” – বেশ কয়েকটি প্রশ্নবাণ ক্রমেই ওর মনের অন্দরে খোঁচা দিতে শুরু করেছে। নীলাদ্রির চারপাশ ঘিরে বিরাজ করছে এক অদ্ভুদ নিস্তব্ধতা, শুধু তোলপাড় হচ্ছে ওর মন।

ওর চারপাশের অদ্ভুদ শান্তি কেমন যেন ঝড়ের পূর্বাভাস বলে মনে হচ্ছে ওর। তবে এবার মনস্থির করে নিয়েছে ও। আর নয় এবার সত্যের জন্য সমাজের মুখোমুখি হতেও প্রস্তুত নীলাদ্রি। ওর নিজের স্বভাবকে আর সমাজের ভয়ে লুকিয়ে রাখবেনা ও। ভগবান ওকে সৃষ্টি করেছে ওর মত করে। নিজের মত করেই বাঁচবে ও।

“আসছি” – কলিং বেলের আওয়াজে দরজার ওপার থেকে মায়ের গলা শুনতে পেল নীলাদ্রি। গলার স্বরটা শুনেই মনে খটকা লেগেছিল নীলাদ্রির। দরজা খুলতেই সবটা স্পষ্ট হয়ে গেল। সোফায় বসে রয়েছে রৌত্রিক। তবে সঙ্গে নেই তিয়াসা।

ঘরে ঢুকতেই বাবার গলা কানে এল নীলাদ্রির, “শেষমেশ এইদিন দেখালি কুলাঙ্গার ছেলে। এরপর আর কাউকে মুখ দেখাতে পারব আমরা? কি বলেছিস তুই ওকে, তুই ‘পুরুষপ্রেমী’ । তুই কি আদও পুরুষ! এমন কথা পুরুষের মুখে মানায় না। আর যদি একবারও তোর মুখ থেকে এরকম কোনও কথা আমি শুনতে পাই……”

বাবার চরম শাস্তি ধার্য্য করতে না দিয়েই গর্জে উঠল নীলাদ্রি, – “হ্যা আমি পুরুষ, আমিও পুরুষ। এই সমাজের বুকে রৌত্রিক বা তুমি যতটা পুরুষ, ঠিক ততটাই পুরুষ আমিও। ফারাকটা শুধু এখানেই যে তোমারা আকর্ষিত হও নারীদের প্রতি। আর আমি আকর্ষিত হই পুরুষের প্রতি” – নীলাদ্রির গলায় ঘৃণা ও প্রতিবাদের সুর এতটাই তীব্রতর যে তার সামনে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে ওর বাবাও – “আর সমাজে প্রকৃত পুরুষের ব্যাখ্যা ঠিক কেমন হবে তা কে ঠিক করে দিয়েছে? পুরুষ মানেই তাকে কঠিন হতে হবে কে জানিয়েছে? নারী বা পুরুষ হয়ে জন্মানোর পর কেন তাকে সমাজ এর বেঁধে দেওয়া নিয়মেই চলতে হবে? পুরুষ নমনীয় হতে পারবেনা কেন? পুরুষ শাড়ি পড়তে পারবেনা কেন? পুরুষ যদি নিজেকে সাজিয়ে তুলতে চায় সুগন্ধী দ্রব্যে, রকমারি রঙের স্পর্শে তাতে দোষ কোথায়? এরফলে সে পুরুষ থাকবে না কেন?”

নীলাদ্রির একের পর এক প্রশ্নবাণের জবাব খুঁজে পাচ্ছেনা ওর বাবাও। তবে নীলাদ্রি এখনও সরব, “কেন প্রত্যেককে মানুষ হিসাবে দেখা হবে না? কেন তার গুন গুলো দেখা হবে না? সমাজ কি বলবে সেই ভয়ে কেন নিজেকে লুকিয়ে রাখতে হবে? কেন নারী পুরুষের ভেদে মানুষ ওপরে নয়? কেন প্রথা ভাঙে পুরুষ নমনীয় হলেই তাদের নারী বলে কটাক্ষ করা হবে?” তারাও পুরুষ, আমিও পুরুষ।

নীলাদ্রির দাপটে বয়ে চলা তীব্র ঝড়ের পর ফের একটু শান্ত হয়ে উঠছে নীলাদ্রিদের বসার ঘর। নীলাদ্রির প্রশ্নের জবাব খুঁজে চলেছেন ওর বাবা। একপাশে নিশ্চুপ বসে রয়েছে রৌত্রিক। ছেলের দিকে তাকিয়ে এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছেন নীলাদ্রির হতবাক মা। সকলের ঘোর কাটলো ফোনের শব্দে। নীলাদ্রির ফোনে ম্যাসেজ ঢুকেছে। ফোনটা হাতে নিয়ে ম্যাসেজটা সিন করে দরজার দিকে তাকালো ও। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিয়াসা। কারোর কোনও অনুমতির অপেক্ষা না করেই ছুটে এসে নীলাদ্রিকে জড়িয়ে ধরলো ও। দুই জনেই নিশ্চুপ।

নীলাদ্রির চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে তিয়াসার কাঁধ। ঘর থেকে বেড়িয়ে গিয়েছে রৌত্রিক। তিয়াসার এই অসহ্য নাটক আর পছন্দ হচ্ছে না ওর। নীলাদ্রিকে তিয়াসার সমর্থন মূল্যহীন ওর কাছে। সদ্য ঘটে যাওয়া ঝড়ের দাপটে মাটিতে বসে কাঁদছেন নীলাদ্রির মা। এখনও নির্বাক ওর বাবা। বাড়ির পাশের পুজোর মন্ডপে বাজতে শুরু করেছে ঢাক। নীলাদ্রির হাতের স্পর্শে ওর ফোনের ম্যাসেজ বক্সে বারংবার আলোকিত হয়ে উঠছে তিয়াসার ম্যাসেজটা – "হ্যা তুইও পুরুষ।

***

# নিশির ডাক

## অগ্নিমিতা দাস

" হ্যাঁ লো! ছুঁড়িকে শুনলাম নিশিতে পায়! তা ঝাঁড়ফুক কিছু করলি! টানা বারান্দায় শীতের মরা রোদ এসে পড়েছে, তাতে পিঠ দিয়ে বসে ফোকলা দাঁতে ওপাড়ার মজুমদারদের ঠাকমা কথাটা পাড়লো। কুটনো কুটতে কুটতে মিনতি একবার ঘরের ভেতরটা চট করে দেখে বলল_তোমার কোন চেনাজানা ওঝা বা গুনীন আছে। আমাদের কর্তা শুনলে তো বাড়িমাত করবে। উনি পরামর্শ করছেন কোলকাতায় গিয়ে চিকিৎসে করাবেন। আমি মুখ্যসুখ্য হলে ও মা তো! বেশ বুঝতে পারি এ ডাক্তারের সারানো কর্ম নয়। থেকে থেকেই মেয়ে রাতবিরেতে দরজা খোলা পেলেই গ্রামের শ্মশানে না হলে , ক্ষেতে না হলে ভূতুড়ে পোড়া জমিদার বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়। আমরা তো সবসময় তটস্থ থাকি। কিন্তু ঠিক একটু নজর ঢিলে হলেই মেয়ে নিশি পাওয়ার মতো ঘোরে হাঁটে। তখন কাউকে চিনতে পারে না। ওর বাপ , হারু পিছু পিছু হাঁক দিতেই ওর নেশা কাটে। তখন চারিদিক অন্ধকার দেখে ভয়ে কাঁদে। মেয়েমানুষ রাত বিরাতে বেরোলে কখন কি হয় ? মিনতি বটি ছেড়ে দুহাত উপরের দিকে গড় করলো।

__ কত ঠাকুর, পীর বাবার দরগায় গেছি । যে যেখানে বলেছে। কত দূর দূর মেয়েকে নিয়ে ছুটেছি, কিন্তু হয় নি।

__ দুপুরবেলায় নিশ্চয়ই তোমার ধিঙ্গি মেয়ে খোলা চুলে মুখার্জীদের বটতলা দিয়ে গিয়েছিল নয় তো হালদারের পুকুরঘাটে বসে বসে আচার সাঁটাছিলো। কিছু মনে করো না বৌমা, তোমার মেয়ে ও কম চরে বেড়ুনে নয়।

মিনতি ভয়ংকর মুখরা, অন্যসময় হলে এই ঠাকমার বাপবাপান্ত করে ছাড়তো। বয়স্ক বলে রেহাই দিতো না, কিন্তু এই বুড়ির কাছে অনেক সুলুকসন্ধান আছে।

_ আমি তাহলে আসি! শনিবার আমি ওঝাকে নিয়ে দুপুরবেলায় আসবো খন। তোমার মরদটাকে আগে বলে রেখো বাপু! আর ওই ছুঁড়িকে চান টান করিয়ে একেবারে শুদ্ধ করে রেখো। এখন ওর মাসিকের সময় নয় তো? মিনতি মাথা নাড়তেই বুড়ি ভাঙ্গা মাজা নিয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে ঠুকটুক করতে করতে এগোলো। কোলকাতা থেকে বেশ কিছুটা দূরে এই গ্রামটা প্রায়

বড়োসড়ো গল্পের মতোই। কিন্তু এই হৃদয়পুরের মানুষজনের হৃদয়ে এখনো সেই শ্যাওলা পড়া সেকেলেপনা যায় নি। তাই শিউলির নিশিতে পাওয়া নিয়ে মেয়েদের পুকুর ঘাটে, বটতলায় বুড়োদের আসরে চললো জোর চর্চা।

আসলে শিউলির এই নিশি অভিযানে গ্রামের বেশ কিছু মানুষের মুস্কিল হয়ে গিয়েছিলো।

মধ্যরাতে চুপিসারে পুকুরপাড়ে দত্তজেঠু যখন ওর বিধবা ভাইয়ের বৌকে জামাকাপড় খুলে আদর করতো তখন হঠাৎ করে শিউলির আগমনে ওরা অস্বস্তিতে পড়তো। কিন্তু শিউলির তো কোন বিকার ছিলো না, সে আচ্ছন্নের মতো পাশ কাটিয়ে হেঁটে যেতো। শিউলি যদি ঘুমের ঘোরে না থাকতো তাহলে শ্মশানে মন্দিরের পুরোহিতের কাছে চুপিচুপি ঘোষালদের বড় বৌকে স্বামীকে বশ করার জন্য তাবিজ নিতে, আঁচল থেকে ভারি ভারি গয়না বার করে দিতে দেখতে পেতো। কিন্তু অন্যরা ওর এই উপস্থিতিতে বেজায় চটতো।

শিউলি এই গ্রামেরই হাইস্কুলে ক্লাস এইটে পড়ে। লেখাপড়ায় বেশ ভালো, ছবি আঁকতে ভালোবাসে আর ভালোবাসে বই পড়তে। সেই ভালোবাসার রসদ জোগায় ওর বাবা পীতম্বর লাহিড়ী। পাশের গ্রামের হাইস্কুলের ভৌত বিজ্ঞানের শিক্ষক।

শিউলির যখন ছ বছর বয়স, তখন থেকেই নাকি এই রোগের উৎপত্তি। সারাদিন কোন ঝুটঝামেলা নেই। মধ্যরাতেই ঘুমের ঘোরে হাঁটতো। তখন নাকি তার মা তাবিজ কবজ কি সব করেছিলো। কিন্তু ইদানিং বছরখানেক হলো রোগটা বেড়েছে। ভয়ে ভাই হারু ওর সাথে শুতে চায় না। দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে ও লাভ হয় নি। গ্রামের নিয়মমতো ঘরের বাইরে উঠোনে বাথরুম থাকার জন্য মাঝে মাঝে শিউলি দরজায় ধাক্কা দিলেই খুলে দিতে হতো। তখন মিনতি হয়তো ঘুমের ঘোরে দরজা দিতে ভুলে যেতো। অমনি ভোররাতে মেয়ে হাওয়া। পাড়ার সবাই লন্ঠন নিয়ে খোঁজাখুঁজির পর দেখা মিলতো।কখনো শস্যক্ষেতে বা কখনো গোলাবাড়িতে তো কখনো পুকুরঘাটে জলে পা ডুবিয়ে। মেয়ে যেন তখন অন্য জগতের বাসিন্দা, সবাই ঠ্যালা দিয়ে ডাকাডাকির পর শিউলির চমক ভাঙতো। তখন ওর আগের কথা কিছুই মনে করতে পারতো না।

শনিবার স্বামী কোলকাতায় কোন সাহিত্য সভায় গেলে মিনতির পোয়া বারো। মেয়েকে চটপট স্নান করিয়ে একটা নতুন ছাপা শাড়ি পরিয়ে দিলো। শিউলি মোটেও শাড়ি পরে না,বাবার এনে দেওয়া কোলকাতা থেকে নিত্যনতুন ড্রেস, ফ্রকেই সে অভ্যস্ত। মায়ের এই ব্যাবহারে একটু অবাকই হলো। মিনতি দেবীর সাফ কথা তোমার ভূত তাড়াতে পুজো হবে। ঠাকমা ঠিক লাঠিতে ভর দিয়ে ওঝা নিয়ে হাজির। ওঝা তো ঘরে পা দিয়ে নাক দিয়ে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে বলল_ এই ঘরে তেনাদের বাস রয়েছে। ওই মেয়ের ঘাড়ে কোন অপঘাতে মরা পেত্নীর বাস আছে। বলেই হাতের ঝাঁটাটা বনবন করে ঘোরাতে লাগলো, চোখ থেকে যেন আগুন বের হচ্ছে।

_ আয় ডাইনি! আয় পিশাচনী! দেখ তোর বাপের ও বাপ এসেছে, তোকে ঝেঁটিয়ে এই গৃহস্থের বাড়ি থেকে যদি না বার করতে পারি তাহলে আমার নাম ও জগাই ওঝা নয়। ভূত_ প্রেত, ব্রহ্মদৈত্য, মামদোর যম। ওঝা কি একটা ছেটাতেই সবার চোখ জ্বালা করতে লাগলো। শিউলি তো ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। ওর মা, ভাই সব ওকে উঠোনে ছেড়ে ঘরে দোর দিয়েছে। এমন সময় পীতাম্বরবাবুর প্রবেশ। লাইনে কি একটা গন্ডগোল হয়েছে বলে কোলকাতাগামী ট্রেনটা বাতিল হয়েছে, বিকেলের আগে কোন ট্রেন নেই। তিনি বাড়ির এই মূর্খতা আর অসভ্যতায় হতবাক হয়ে গেলেন। ওঝাকে বিদায় দেওয়ার জন্য ঠাকমা

পাড়াগেঁয়ে অকথ্য ভাষায় শিউলিকে শাপশাপান্ত করতে করতে বিদায় নিলো। পীতাম্বরবাবু একসপ্তাহ পরে এক বন্ধুর পরামর্শে মেয়েকে নিয়ে কোলকাতায় চলে গেলো। নামকরা সাইক্রিয়াটিকসের সাথে কনসাল্ট করে জানতে পারলো, এটা একটা স্লিপিং ডিসঅর্ডার। ডাক্তারি ভাষায় এর নাম প্যারাসমনিয়া। এটা সাধারণত গভীর ঘুম আর জাগার মধ্যবর্তী অবস্থায় ঘটে। এই সময় মানুষ ঘোরে হাঁটতে থাকে। তবে এই অবস্থা বেশিক্ষণ থাকে না, দশ মিনিট বা এক থেকে দেড় ঘন্টা।ওই মুহূর্তগুলোতে পেশেন্টকে খুব ট্যাকফুলি ট্যাকল করতে হয়। খুব আলতো বা মৃদু ভাবে ঠেলা দিয়ে জাগাতে হয়। ধারেকাছে কোন ধারালো অস্ত্র রাখা বিপদের কারন সে তখন নিজের বশে থাকে না। তবে ছেলেবেলায় ধরা পড়া এই রোগটা ঠিকমতো চিকিৎসা করালে সব ঠিক হয়ে যাবে। শিউলি বাবার সাথে কোলকাতায় গিয়ে কাউন্সিলিং করাতো। হাল্কা আলোয় রোজ নিয়ম করে মেডিটেশন করতে বলেছিলো, সাথে কিছু ওষুধপত্র। ডাক্তারের কথায় দরজায় এলার্ম লাগানো হলো যাতে শিউলি ঘুমের ঘোরে আর অসতর্ক মুহূর্তে ঘর থেকে বেরোতে না পারে।

_ তুমি কি আমার সাথেই ডিনার করবে? বর্ণর ডাকে শিউলির চমক ভাঙলো।মাথা নেড়ে সম্মতি দিলো। ব্যালকনিতে বসে শিউলি অতীতের সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিলো। দখিনের হাওয়া ওর কপাল চুল চুমু খেয়ে লুটোপুটি করছিলো। দূর থেকে ভেসে আসছিলো মিস্ত্রিদের ভোজপুরি ভাষায় হোলির গান। সামনেই দোল। আকাশে চাঁদ তার দেহসৌষ্ঠব বেশ বাড়াতে শুরু করেছে। শিউলিদের বাড়িটা বাইপাসের একধারে। এদিকটা একটু নিরালা, লোকজন কম। তবে আশেপাশে জলা বুজিয়ে প্রকান্ড প্রকান্ড হাইরাইজিং বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে।দুতিনবছরের মধ্যে সব গমগম করবে। দূর থেকে ওই বিল্ডিংগুলোকে একচক্ষু দৈত্যের মতো লাগছে, কারন মাঝে মাঝে ইঁটের ফাঁকে মিস্ত্রিরা আলো জ্বালিয়ে রান্না করছে। শিউলির খুব ইচ্ছে ছিলো ফ্ল্যাট নয়, বাড়িতে থাকবে। গ্রামে বড়ো বাড়িতে হাত পা মেলে থাকা তার অভ্যাস। একটু ফাঁকা ফাঁকা জায়গায়। তাই বর্ন বাইপাসের এই দিকটায় তুলনামূলক ভাবে একটু সস্তায় জমি পেয়ে দু'বছর হলো বাড়ি করে এখানে এসেছে।

__ কি হলো? খাওয়ার সার্ভ করবে না আমি করবো?

বর্নর কথায় শিউলি যেন যন্ত্রের মতো ডিশে রান্নার মাসির করে দেওয়া চিকেন আর পরোটা দিচ্ছিলো।

__ এনিথিং রং শিউ!

_ না, মাথাটা একটু ধরেছে। স্ন্যাগটা ঠিক করতে করতে আড়চোখে বর্ণকে দেখে নিয়ে বললো__ তুমি আজ গাড়ি নিয়ে যাও প্লীজ।

__ কিন্তু আমার তো টাইম দেওয়া আছে , গাড়ি একঘন্টা পরেই পিক করতে আসবে। শুধুমুধু পেট্রল পুড়িয়ে নিজের গাড়ি বার করতে যাবো কেন? বর্ণ একটা নামকরা বিদেশি কোম্পানীতে বড় পোষ্টে চাকরি করে। ওদের সময় অনুযায়ী দিন হলে ও এখানে রাতের বেলাতেই ওকে অফিস করতে হয়। অফিসের গাড়ি ওকে পিক করতে আসে। আগে অন্য কোম্পানিতে চাকরি করতো, একবছর হলো এখানে জয়েন করেছে।

__ গাড়িটা নিয়ে যাও প্লীজ ! শিউলি দাঁতে দাঁত চেপে কথাটা বললো। বর্ণ কি কিছু বুঝলো। হয়তো বুঝেই অফিসে ফোনটা করলো। শিউলি মাধ্যমিক দেবার পর ওর ওই প্যারাসমনিয়া চলে গিয়েছিলো। শিউলিকে পীতাম্বর বাবু বোর্ডিং এ রেখে পড়াশোনা

করান। হোস্টেলে একদিন ওর স্লিপওয়াকিং হয়েছিলো। সেদিন ওর রুমমেট ছাড়া ব্যাপারটা কেও জানতো না। একদিন ব্যাস ! ওই একদিন বড়োবেলায় হয়েছিলো। ইয়ুনিভার্সিটিতে বর্ণর সাথে গভীর প্রেম তারপর বিয়ে। বর্ণকে ও নিজের অসুখের কথা

বলেছে। ও পাত্তা দেয় নি। কি করে দেয়, বিয়ের চারবছর হতে চললো একদিন ও তো সেইরকম কিছু ঘটে নি। শিউলি সরকারি ব্যাঙ্কে চাকরি করে, দশটা পাঁচটা। বর্ণর এই নতুন অফিসে জয়েন করার পর থেকেই ওকে একা থাকতে হয়। নিঃসঙ্গতা থেকেই কি এই রোগটা চাগাড় দিলো। গতপরশু বর্ন যাবার পর ওর স্পষ্ট মনে আছে দরজায় লক করে গল্পের বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে গেছিলো। ঘুম ভাঙ্গলো নাইট স্যুটের পকেট থেকে মোবাইলের আওয়াজে। ঘোর ভাঙতেই ও দেখলো ওদের বাইপাশের রাস্তায় একা দাঁড়িয়ে আছে। দৈত্যের মতো বড়ো বড়ো লরি ওর পাশ দিয়ে হুশহাশ করে যাচ্ছে। মোবাইল বেজেই যাচ্ছিলো। বর্ণর ফোন,

ও জানে শিউলি রাতে ঠিকমতো ঘুমোতে পারে না। তাই মাঝে মাঝে সময় পেলে ফোন করে। শিউলি ও তাই পকেটে মোবাইল রেখে ঘুমিয়ে গেছিলো। মোবাইলের ঘড়িতে তখন রাত তিনটে। টলতে টলতে বাড়ি এসে দেখে দরজা হাট করে খোলা। ভাগ্যিস চোর ঢোকে নি, এদিকটা যা নিরিবিলি। বর্ণ ও আর ফোন করে নি ভেবেছে ও ঘুমোচ্ছে। তাই তো ইচ্ছে করেই শিউলি বর্ণকে গাড়ি নিয়ে যেতে বললো। যদি ঘুমের ঘোরে গাড়ি ড্রাইভ করে কোন অঘটন ঘটায়। নতুন অতিথি আসছে পৃথিবীতে।

_ আমি বেরোলাম, টেক কেয়ার ইয়োরসেল্ফ বলে শিউলিকে দীর্ঘ চুম্বন করে বর্ণ গাড়ির চাবি হাতে নিলো।

_ গাড়ি নিয়ে চললাম। ঘুমিয়ে পড়ো আর মিষ্টি মিষ্টি বেবীর স্বপ্ন দেখো। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার আজ কনফারেন্স আছে।বলেই বর্ণ বেরিয়ে গেলো। শিউলি গতমাসে কনসিভ করেছে। বর্ণকে পরশুরাতের ঘটনাটা বলি বলি করে বললো না। শিউলি ড্রেস চেঞ্জ করে নাইটি পরলো, অনেকক্ষণ ধরে রাত্রি প্রসাধন করলো। তারপর কি ভেবে মা বাবাকে ফোন লাগালো। হারু ওরফে হিরণ এখন ব্যাঙ্গালোরে, ওখানেই মা বাবাকে নিয়ে গেছে, গ্রামের বাড়ি এখন খাঁ খাঁ। আধঘন্টা গল্প করার পর একটা থ্রিলার মুভি দেখতে বসলো। মুভিটা ভীষন বোরিং, গল্পের গোরু গাছে উঠেছে। বন্ধ করে হাল্কা মিউজিক শুনতে লাগলো। শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে গেলো।

এই জায়গাটা আলো আঁধারির খেলা চলে। গাছপালা ও একটু বেশি। স্ট্রীট ল্যাম্পের আলো এখানে আবছা আসে। বড় বড় বোল্ডার রাখা আছে, লোহার রড ছড়ানো ছিটানো রয়েছে।

ওখানে গোঙানি শুনতে পাওয়া গেলো। বছর এগারো বারোর রুক্ষ কটা চুলের দুবিনুনির মেয়েটাকে চারটে লোক টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসছে। মেয়েটা বোধহয় মায়ের পাশে ফুটপাতে শুয়েছিলো। মদে চুর হয়ে যাওয়া জন্তুগুলো ওকে মুখে চাপা দিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে। মেয়েটার ফ্রকের পিছনটা পুরো ছেঁড়া, সেফটিন দিয়ে আটকানো। সদ্য ওঠা বুকদুটো ডলতে ডলতে লোকগুলো খ্যাঁকখ্যাঁক করে হাসতে লাগলো। খড়ি ওঠা পা ধরে একজন টানতে যাবে হঠাৎ দেখে আবছা আলোয় খোলা চুল, সাদা নাইটি পরে কে যেন এগিয়ে আসছে। কে ওটা! ওপাশের জলার পেত্নী! ফিনকি দেওয়া চাঁদের আলোয় সাদা নাইটি পরা পেত্নীটা কেমন যেনো ঘোরের মধ্যে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। ওরা পাঁজাকোলা করে ধরা মেয়েটাকে ফেলে পেছন দিকে দৌড় লাগালো।মেয়েটা ভয়ে চোখ বন্ধ করতে বাধ্য হলো। দূরে একটা রাতজাগা অদ্ভুতভাবে ডেকে উঠলো।

***

# মুক্তি

বীণা সেনগুপ্ত

প্রাচীনকালেও অনেক সাধু পুরুষ পদব্রজে বিশ্ব পরিক্রমণ করতেন। তাহাদের মধ্যে একজনের সম্পর্কে ঘটনাটি লিখিতেছি মহাপুরুষদের নিয়ে কোন গল্প লেখা শক্ত। জানিনা আমি সফল হবো কিনা? যদি হই তাহলে তার আশীর্বাদেই হইব।

যে মহাপুরুষকে নিয়ে লিখছি তার নাম বিশ্বম্ভর আচার্য্য। তিনি অনেক জ্ঞান অর্জন করিয়া ছিলেন। শুধু বই পড়ে জ্ঞান অর্জিত করেন নাই, তিনি তপস্যার মাধ্যমে সিদ্ধিলাভ করিয়া বিশ্ব পরিক্রমায় বেরিয়ে ছিলেন। তিনি এই সনাতন ভারতবর্ষের লোক ছিলেন। বিশ্ব পরিক্রমা শেষ করে নিজের দেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষে ফিরে এলেন। বিশ্বম্ভর আচার্য ঘুরতে ঘুরতে কালিগ্রাম নামে একটি ছোট্ট গ্রামে এসে পড়লেন। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে গ্রামের ঘাট বাঁধান পরিষ্কার শীতল জলে মুখ হাত ধুইয়া এবং শীতল হইয়া বটবৃক্ষের তলে আশিয়া উপনিবেশন করলেন। কিছুক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পরলে, হঠাৎ এক রমণীর 'প্রভু' ডাকে তাহার তন্দ্রা ভেঙে গেল। চাইয়া দেখিলেন যে সম্মুখে এক রমণী উপনিবেশন করিয়াছেন। আশ্চর্য উঠিয়া বসলেন, রমণী সস্তাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিলেন প্রভু আপনি সেই বিশ্ব পরিক্রমা বিশ্বম্ভর আচার্য? আচার্য, "হ্যাঁ বৎস, তুমি কি করিয়া চিনিলে আমাকে।

রমণী, "প্রভু অপরাধ করিলে মার্জনা করিবেন। যদি অভয় দেন তো আপনাকে বলি"

আচার্য, "বলো বৎস অভয় দিলাম, তোমার পরিচয় কি?"

রমণী, "আমার পরিচয় হইল আমি শক্তি পদাবলী শ্রী চন্ডিকার নাম গান করি। কিন্তু আমি মন্তব্য হই নাই সেই জন্য তপস্যায় সিদ্ধ হই নাই। আমার নাম রমাবতী। আমার গৃহে শ্রীচন্ডী কালীর মূর্তি আছে। প্রত্যহ পুজো করি। যাতে ব্রাহ্মণ কন্যা। আজ ভোররাত্রে আমি আপনাকে স্বপ্নে দেখেছি এবং তারপর দেবী বলিয়া দিলেন, আপনি আমাকে দীক্ষাদানের পর আমি আমার যে তপস্যা রত আছে, তাহার সিদ্ধি লাভ করিব। তারপর ঘুম ভাঙার পর আমি মনে মনে চিন্তা করিলাম যে এত বড় মহাপুরুষ আসিবে আমাদের এই ছোট্ট নগণ্য গ্রামে এবং তিনি কি আমাকে যদি দীক্ষাদানে রাজি থাকেন তো আমার জন্মান্তরে পূর্ণ ফলের জন্যই হইবে। তাই বলি প্রভু আপনি কি আমাকে দীক্ষা দিবেন?"

আচার্য, "দেখো বৎস আমি এর আগে কখনো কাহাকে ও দীক্ষা দেই নাই। তুমি হইবে আমার প্রথম শিষ্যা। মেয়েরা হচ্ছে শক্তির অংশ অতএব আমি তোমাকে ভালোভাবে অর্থাৎ ঠিক দীক্ষা দিতে পারি তো। আমার বিশ্ব পরিক্রমা সফল হইবে। 'মা' তোমাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন। এই বলিয়া উপরের দিকে তাকাইয়া, মা কালীর নাম স্মরণ করিয়া হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিলেন। আচার্য কাল প্রত্যুষে স্থান করিয়া তোমাকে এই নির্জন স্থানে বটতলে দীক্ষা দিব। তুমি স্নান করিয়া শুদ্ধ হইয়া খাদ্য গ্রহণের পূর্বে আসিবে।

রমা, "আমার গৃহদেবতার প্রসাদ গ্রহণ করিয়া তৃপ্তি হওন গুরুদেব

আচার্য, "এই স্থানে তোমার গৃহদেবতার প্রসাদ গ্রহণ করিব। এই মনোরম বটবৃক্ষের তলে আমি রাত্রি যাপন করিব। যাও প্রসাদ লইয়া আইস। রমাপতি চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে পাথরের থালায় প্রসাদ আয়োজন করিয়া আচার্যের সম্মুখীন নিবেদন

করিল। আচার্য খাদ্য গ্রহণ করিয়া চন্ডিকার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন এবং রমাপতি পাত্র লইয়া প্রস্থান করিলেন। আহা, এই পৃথিবী এখন গোধূলি বেলা কি সুন্দর এই দৃশ্য। চারিদিকে সবুজ ধান্য ক্ষেত্র। মৃদু শীতল বাতাসে ধান্য গুলি মস্তক আন্দোলিত করিতেছে। দেখিয়া মনে হইতেছে যে এই সুন্দর কচি ধান্য গুলি সারাদিন প্রখর রৌদ্র তাপে জর্জরিত হইয়া এখন সুন্দর শীতল বাতাস পাইয়া মনের তৃপ্তিতে হাওয়ার তালে তালে নৃত্য করিয়া আনন্দ করিতেছে। পশ্চিম দিগন্তে সূর্য রক্তিম বর্ণ ধারণ করিয়া অস্ত্র যাইতেছে, এই লাল রঙের মেঘের উপর দিয়া সমস্ত আকাশ ছড়িয়া পড়িতেছে, দেখিয়া মনে হইতেছে যেন পল্লীমাতা কপালে সিন্দুরের টিপ পরী আছে এবং মেঘের কোলে সূর্যের আলো দেখিয়া মনে হইতেছে যে পল্লী মাতা নিজের সন্তানের কথা চিন্তা করিয়া কপাল লাল বর্ণ হইয়া গিয়েছে। চারিদিকে ধান গাছ তার মধ্যে দিয়ে শুরু এক মুঠা পথ আকিয়াবা কিয়া গ্রামের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। এই মেঠো পথ হইতে কিছুদূর মাঠের মধ্যে পুকুর ধারে বটবৃক্ষের তলে উপবেশন কোরিয়া আছেন বিশ্বম্ভর আচার্য। এই আচার্যের গায়ে পড়ন্ত রৌদ্র পড়িয়াছে, দূর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন কোন এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন। আশ্চর্য রাত্রিযাপন করিলেন বটবৃক্ষের তলে। প্রত্যুষে উঠিয়া পুষ্করিনীতে স্নান করিয়া সিক্ত বসন পরিয়া শক্ত উপাসনা করিলেন। কিছুক্ষণ করিবার পর রমাবতি শুদ্ধ বসন পরিয়া একটি থালিকায় পুষ্প, মালা, রক্ত চন্দন, জবা ও গঙ্গাজল প্রভৃতি লইয়া আসিয়া গুরুদেবকে প্রণাম করলেন। আচার্য দীক্ষা দান করিলেন, তারপর দুইজনে নানা প্রকার তত্ত্বকথা বলিতে লাগলেন, এইভাবে অপরাহ্ন হইল রমাপতি আপন গ্রামের প্রাচীন ইতিহাস বলিতে লাগিল। গ্রামের উত্তর দিকে ঘন বনের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিলেন, গুরুদেব ওই বনে একশত বছর পূর্বে ধনবান নামে এক রাজা বাস করতেন। সেই রাজা খুব ধার্মিক ছিলেন। তাহার রাজ্যের প্রজারা সবাই সুখী ছিলেন। রানীর পাপের জন্য রাজ্য সব ছারখার হইয়া গেল। আচার্য একাগ্র মনে শুনিতে ছিলেন, হঠাৎ দূর হইতে বাঁচাও বাঁচাও নারী কন্ঠ ধ্বনিত হইল।, আচার্য চমকাইয়া চাহিয়া রইলেন, আবার সেই শব্দ। আচার্য জিজ্ঞাসা করলেন কার কন্ঠস্বর? রহমতি বলিল সেই রানীর কন্ঠস্বর। আচার্য উঠিয়া দাঁড়াইলে।

রমাবতি, "গুরুদেব যাইবেন না, যাহারা যায় তাহারা আর ফিরিয়ে আসে না।"

আচার্য, "আমাকে দেখিতে হইবে কি ব্যাপার।"

এই কথা বলিয়া তিনি ওই দিকে চলিতে লাগলেন। কিছুক্ষণ যাবার পর গভীর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল। আরো কিছুক্ষণ যাবার পর চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিলো। তিনি একটি গাছে উঠিয়া রাত্রি কাটাইলেন। ভোরবেলা আবার সেই কণ্ঠস্বর শুনিয়া মনে হইল নিকট হইতে এই শব্দ আসিতেছে। তিনি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া ওই শব্দ লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। তিনি গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া উদ্দেশ্যহীনভাবে চলিতে লাগিল। সেই কণ্ঠস্বরও মিলিয়া গেল। এদিক ওদিক চলিতে চলিতে পথ হারাইয়া ফেলিলেন; ক্লান্ত হইয়া কিছুক্ষণ বৃক্ষ তলে বিশ্রাম করিলেন। আবার সেই কণ্ঠস্বর শুনিয়া মনে হইল কেহ বিপদে পরিয়া চিৎকার করিতেছে। এখন কণ্ঠস্বর ঘন ঘন হইতেছে। তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। "শব্দ" আবার থামিয়া গেল। কিছুক্ষণ যাইবার পর হঠাৎ চোখে পরিল এক দেব মন্দির তার সম্মুখে পাথরের বাঁধানো চাতাল, চতুর্দিক ঘাট বাঁধানো পুকুর, পুকুরের চারদিকে ঘন জঙ্গল কিন্তু পুকুরের জল পরিষ্কার এদিক ওদিক চাহিয়া কি করবেন চিন্তা করিতেছেন যে কণ্ঠস্বরই বা কোথা হইতে আসিতেছে? তবে কি এই

মন্দির হইতে আসিতেছে? এখানে মন্দির ছাড়া কিছুই নাই। অন্য কোথা হইতে কি এই শব্দ আসিতেছে? হঠাৎ ঝুমঝুম শব্দ, তিনি মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন কেহ নাই, কি করিবেন চিন্তা করিতেছেন। হঠাৎ পুনরায় নারী কন্ঠস্বর- বাঁচাও বাঁচাও। তিনি দৌড়াইয়া মন্দিরে প্রবেশ করলেন কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। বাঁচাও বাঁচাও ও ঝুমুরের

শব্দে মন্দির ফাটিয়া যাইতেছে। মন্দিরে কোন দেব অথবা দেবীর মূর্তি নাই। মন্দিরের মধ্যে অনেকগুলি কক্ষ আছে। তিনি শব্দ লক্ষ্য করিয়া এই কক্ষ ঐকক্ষ ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিলেন। তিনি ঠিক করলেন ইহা একটা ভৌতিক ব্যাপার ছাড়া কিছুই নয়। কেন এই শব্দ তাহাকে এখানে টানিয়া আনিল? ইহার কারণ বা কি আছে? ওই নারী কন্ঠস্বর নারী বা কোথায়। তিনি বাহিরে যাইবেন, এই অন্ধকূপ হইতে হঠাৎ তাহার চোখে পরিল, ভিতর হইতে প্রদীপের আলো আসিতেছে। তিনি দৌড়াইয়া সেই দিকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন এক কোণে একটি পিতলের পিলসুজের উপর প্রদীপ জ্বলিতেছে। লোহার শিকল বাধা দুটি হাতের, পরিধানে সুন্দর জরির কাজ করা কাপড়, অনেকদিন পড়ার ফলে জীর্ণময়লা হইয়া গিয়াছে, কাপড়ের আগের মতন সৌন্দর্য আর নাই। রমণীর গায়ের রং গৌড়বর্ণ। মাথার চুল রুক্ষ পিঠে ছড়ানো, মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে কিছু চুল। গায়ে কিঞ্চিৎ গহনা। মাথার উপর সিন্দুরের টিপ কপালে সিন্দু। পায়ে ঝুমুর সব মিলিয়া দেখিতে গেলে বোঝা যায় তিনি এককালে সুন্দরী ছিলেন।

আচার্য, "তুমি কে? এখানে এইভাবে কেন পরিয়া রয়েছো?

বন্দী রমনী, "মুখ তুলিয়া দেব আপনি আসিয়াছেন আমায় মুক্তি করিতে। আপনি কি সেই মহাপুরুষ যিনি আমায় এই পাপ অন্তর জ্বালা হইতে মুক্ত করিবেন? আপনাকে ভগবান পাঠিয়েছেন। আপনার নাম কি? অপরাধ মার্জনা করিবেন।

আচার্য, "আপনি কি বলেছেন কিছুই বুঝতে পারিতেছি না। আমাকে আপনি সব খুলিয়া বলুন। আমি শক্তির উপাসক। শক্তিকে উপাসনা করিয়া তপস্যার সিদ্ধিলাভ করিয়া বিশ্ব পরিক্রমা করিতে করিতে এই গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি এবং সংক্ষেপে তিনি রমাবতীর কথাও বলিলেন। আচার্য নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমার নাম বিশ্বম্ভর আচার্য, কিন্তু কথা শেষ হইতে না হইতেই রমণী হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিয়া বলিতে লাগে, আমি এই দেশের রানী। আমার নাম চূড়ামনি, এই দেশের রাজা ধনবান ছিলেন আমার স্বামী। রাজা ছিলেন খুবই ধার্মিক; দেশে কোন কিছুতেই অভাব ছিল না, এই মন্দিরে ছিল দেবী কালীর মূর্তি। আপনি আমার এই শিকল খুলিয়া দিন, অনেকদিন বাহিরে সূর্যালোক, আকাশ, ফুল প্রকৃতির শোভা দেখি নাই। আমার এক দাসি ছিল সে প্রত্যহ আমার আহার্য দেয়া যায়। আজও একটু পরে আসিবে।

আচার্য, "কি করিয়া খুলিবো?"

চুরামনি, "আপনি স্পর্শ করলেই হইবে।"

আচার্য তাহার কথা মতো শুনিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শিকল খুলিয়া গেল। তারপর উভয়ে বাহিরে আসিয়া উপবেশন করিলেন। তারপর বলিতে লাগলেন রানী চুরামনি - আমি খুব সুন্দরী ছিলাম বলিয়া অহংকার ছিল এবং আমি যাহা চাইতাম রাজা কষ্ট করিয়া হলেও তাহা আনিয়া দিতেন। তবুও আমি বিলাস ভোগে তৃপ্ত হইতাম না। এই কথা বলিয়া একটু চুপ করিলেন।

আচার্য, তারপর-

চুরামণি, এই কালী মন্দিরে পূজারী ছিলেন একজন তান্ত্রিক। এই দেবী জাগ্রত ছিলেন। তান্ত্রিক একমাত্র আমার প্রকৃতি জানতেন। একরাত্রি কালে কালী পুজো সময় মহারাজা কে সঙ্গে লইয়া দাস-দাসী পরিবৃত্ত হইয়া পূজার উপকরণ লইয়া, এই মন্দিরে পূজা করিতে আসিয়াছিলেন। তখনকার নিয়ম ছিল, ওই বছরে ওই রাত্রিতে রাজা ও রানী একসঙ্গে দেবী কালিকা কে

সাজসজ্জা করিবেন। নিজের মনের মতো অলংকার দিয়া। অনেকদিন হইতে আমার লোভ ছিল ওই দেবীর গহনার প্রতি। সেই রাত্রিতে সাজসজ্জা শেষ করিয়া, পূজা আরম্ভ হইল। সকলের পুজোর দিকে মন, আমার মন পুজোর দিকে ছিল না ছিল ঠাকুরের অলংকারের প্রতি। এই বলিতে বলিতে চক্ষে জল মুছাইয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রকৃতির দিকে চাহিয়া পুনরায় গল্পটি বলতে লাগিলেন।

পূজার শেষে তান্ত্রিক রাজাকে ও আমাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন; এবং বলিলেন "মা" আপনি সত্যি "মা" -র গহনার প্রতি আসক্ত আছেন। এই গহনা আপনি পরিধান করুন। এই গহনা মা পড়িতে চান না। এই বলিয়া তিনি সব গহনা আমার সম্মুখে রাখিয়া এবং বলিলেন, আপনি এই অন্ধ গৃহের মধ্যে বন্দী থাকিবেন, এই অভিশাপ দিবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজা তাহার পাশে পায়ে লুটিয়া পরিল। আমিও কাঁদিয়া উঠিলাম, তিনি আরো বললেন, রাজা তুমি ধার্মিক কিন্তু যেহেতু রানীকে দেখিতে সুন্দর সেই হেতু আপনার স্ত্রী খুবই গর্বিত। গর্ব করার মহাপাপ, আমি চলিয়া গেলে এই রাজ্য ধ্বংস হইবে। রানী এইখানেই বন্দি থাকিবেন। তারপর তাহার পায়ে ধরিয়া কাঁদিতেই তিনি বলিলেন, এই মুক্তির উপায় একটি আছে। একশত বৎসর পর এই গ্রামে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিবে। তিনি আপনাকে মুক্ত করিবেন এবং আপনার সমস্ত ঘটনা তাহাকে বলিলেন, তারপর রানী জিজ্ঞাসা করলেন, কি করিয়া তিনি বুঝবেন এইখানে এই মন্দিরের মধ্যে আমি আছি

তান্ত্রিক, আপনার বাচাও বাচাও চিৎকার শুনিয়া তিনি আসবেন এবং আপনাকে উদ্ধার করিবেন। ওই মহাপুরুষের সামনে আপনার ও আপনার দাসীর মৃত্যু ঘটিবে। তিনি আপনাদের সৎকার করবেন। আমি এই অভিশাপ দিলাম এবং মুক্তির পথও বলিয়া দিলাম। আমি এই মা কালীর মূর্তি লইয়া চলিয়া যাইবার পরই রাজা সহ এই রাজ্য ধ্বংস হইবে।

বন্দি রমণী, "তারপর তান্ত্রিক কালী মূর্তিকে লইয়া চলিয়া গেলেন, রাজাও চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে চলিয়া গেলেন। আমি সেই থেকেই এই গৃহের মধ্যে বন্দি, আমার দাসীর মুখে শুনলাম যে দেশে এক মহামারী আসিয়াছিল। সেই মহামারী রাজা সহ গোটা রাজ্যটিকে গ্রাস করিল। সবাই মরিল মাত্র আমরা দুজন ছাড়া। আজ আমার অনেক বয়স হইয়াছে।"

এই কথা শুনিয়া আচার্য কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর সম্মুখে একজন রমণী আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি দেখিলেন ইহাকে রানীর অপেক্ষা বয়স্ক হইলেও দেখিতে সুন্দরী।

বন্দি রমণী, "দাসীর দিকে চাইয়া বলিলেন এই যে বীর বালা? ইনি হচ্ছেন সেই মহাপুরুষ যিনি আমাদের মুক্ত করিবেন। রানীর কথা শুনিয়া দাসী প্রণাম করিল, আমি ওই পুকুরের শীতল জলে স্নান করিব। বলিয়া দাসীসহ পুকুরের দিকে চলিয়া গেল।"

আচার্য চিন্তা করতে ছিলেন, একি অদ্ভুত ব্যাপার। তাহার থেকে আরও বড় সাধু আছে। তিনি তাহাদের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। এইসব কি তিনি স্বপ্নে দেখিতেছেন? না সত্য ঘটনা। তারপর রানী পুকুর হইতে উঠিয়ে আসিলেন। মন্দিরের ভিতরে গিয়া বেদির

সম্মুখে নত মস্তকে কালীমূর্তিকে স্মরণ করিয়া নমস্কার করলেন, তারপর আচার্যের সম্মুখে আসিয়া হাতজোড় করিয়া বলিলেন, প্রভু আপনি আমাদের মুক্তি করুন, এই অভিশপ্ত জীবন থেকে। এই মন্দিরের নিচে একটা ঘরে প্রচুর ধন-রত্ন ও মোহর আছে। আপনাকে দক্ষিণা স্বরূপ সেগুলি দান করিলাম। আপনি গ্রহণ করুন। এই বলিয়া আচার্যের সম্মুখে রানী ও দাসী প্রণাম করিলেন

আচার্য, "তথাস্তু, সব আপনার দান গ্রহণ করলাম।"

আচার্যকে প্রণাম করিবার সময় তাহারা মাথা নিচু করিলেন আর মাথা তুলিলেন না। উভয়ের মৃত্যু হইল। তারপর আচার্য মন্দিরের পাশে চিতা সাজাইয়া সৎকার্য করলেন এবং চিতাভস্ম মাটি খুঁড়িয়া তুতিয়া দিলেন। তারপর আচার্য চিন্তিত মনে গ্রামে ফিরিয়া আশিয়া তাহার শিষ্য রমাপতি কে সব কথা বললেন। শুধু বললেন না মাটির নিচের সব ধনসম্পদের কথা।

তিনি ওই কালী মন্দির ঠিক করিয়া কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে বললেন, তিনি আরো বলিলেন যে কোন লোক পূজা দিতে আসিয়া যেন শুধু মুখে ফিরিয়ে না যায়। এই মন্দিরের নাম রাখা হইলো নাগচূড়া কালীমন্দির। এই কালি খুবই বিখ্যাত এবং ইহা প্রতিষ্ঠার দিনে প্রতি দিন মেলা বসে। বিশ্বম্ভর আচার্য দুই বেলা ভক্তি ভরে পূজা করেন, রানী আত্মা যেন শান্তি পায় সেই জন্য প্রার্থনা করেন।

***

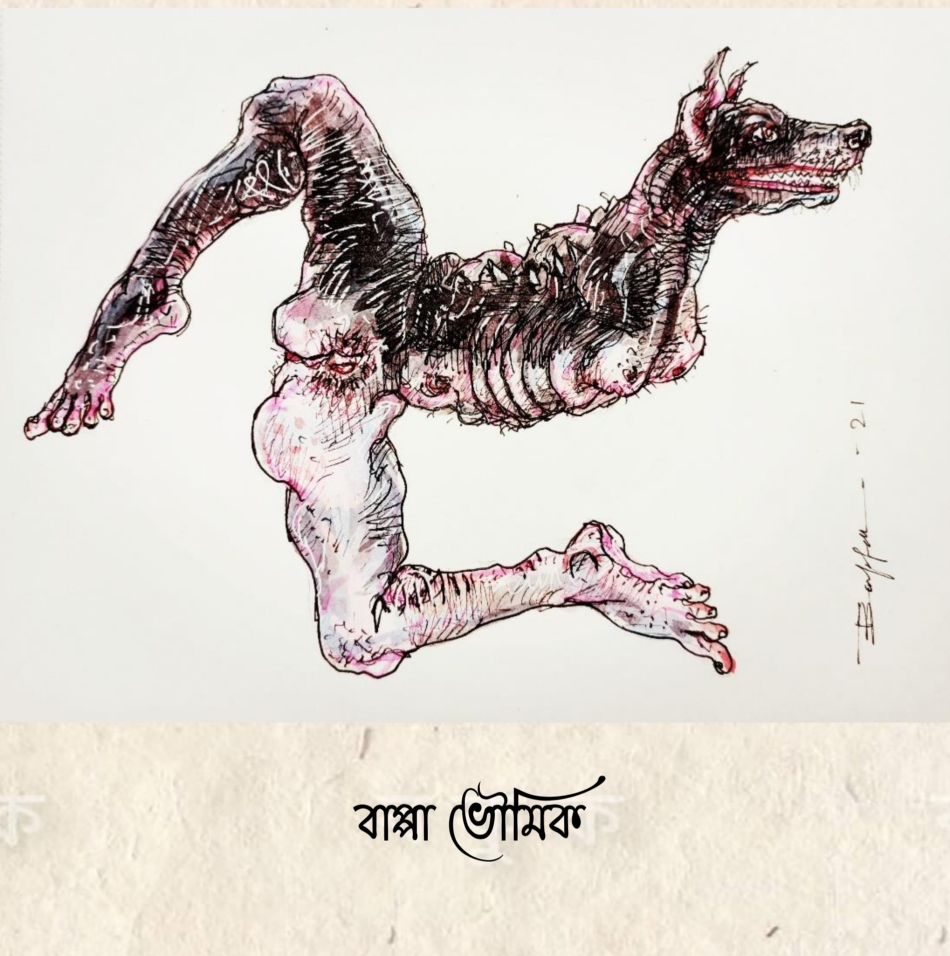

বাপ্পা ভৌমিক

# I LOVE YOU

সীমন্ত রায়

(আজ তোমরা শুনবে এক ভীতু ছেলে আর দাপুটে মেয়ের গল্প। অবশ্যই প্রেম, তা নাহলে আর গল্প কিসের বলো। তাহলে একেবারে গোড়া থেকে শুরু করি। প্রথমের আসুন আমাদের নায়ক ও নায়িকার সাথে আলাপ করিয়ে দেই। শতদ্রু ও শ্রীপর্ণা। দুজনেই মাস-কমিউনিকেশনের স্টুডেন্ট। শতদ্রু বি.এ পাশ করেই চাকরি শুরু করছে বিজ্ঞাপনের আর শ্রীপর্ণা এখনো লেগে আছে, মাস্টার্স করছে। দুজনের দেখা হয় কলেজেই, আর সেখান থেকেই সব সমস্যার সূত্রপাত। শতদ্রু কে একটু লাজুক বললে খুব কম বলা হবে। কোন ব্যাপারে কিছু করতে হলেই স্যারের শুরু হয়ে যায় দোনামোনা। করব! নাকি করব না! করলে যদি ভুল কিছু হয়? না করলে যদি আরো বেশি ভুল হয়? দাঁড়িপাল্লার ওজন সমান করতে করতে সময়টা পেরিয়ে যায় এবং স্যার হাতে বাটখারা নিয়ে বসে থাকেন। শতদ্রু ও শ্রীপর্ণার সম্পর্কটা ঠিক ওই একই রকম ভাবে শুরু হয়েছিল। )

(সিন: কলেজ লাইফ )

কুন্তল: তুই কি মাইরি! সেই কবে থেকে মেয়েটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছিস, আরে কথা তো বল নাকি?

শতদ্রু: না বাবা! যদি রেগে যায়, বাজে একটা কেস্ হবে, দরকার নেই।

কুন্তল: আরে, রেগে গেলে মানে! ওতো আর বাঘ-সিংহ নয় যে রেগে গিয়ে তোকে খেয়ে ফেলবে।

শতদ্রু: না না, কি দরকার বাবা! ভালোই তো আছি। ছাড় না।

কুন্তল: আচ্ছা শোন তোর খিদে পেলে তুই কি করিস বলতো? খাবারটা খাস তো নাকি খাবারের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকিস? আর ভাবিস খেতে গেলে বিরিয়ানিটা যদি রেগে যায়।

শতদ্রু: ধুর!

কুন্তল: ন্যাকা! এমনিতেও খেলাটা আর এখন তোর হাতে নেই।

শতদ্রু: মা.. মা.. মানে?

কুন্তল: মানে ওই দেখ ম্যাডাম এদিকেই আসছে।

শতদ্রু: ও ও ওরে বাবা! বলছি শোন না, আমি পালাই।

কুন্তল: এই শালা, কোথাও পালাচ্ছিস, এক লাথি খাবি, চুপ করে এখানে বস। চপ।

শ্রীপর্ণা: হাই! আমি শ্রীপর্ণা।

শতদ্রু: হা... হা... হাই আমি শ.. শ.. শ.. শতদ্রু।

শ্রীপর্ণা: হ্যালোউউউ! শ..শশ.. শতদ্রু (সশব্দে খিলখিল করে হেসে)।এই তুমি কি তোতলা?

শতদ্রু: না না ইয়ে মানে। (কিছুটা ঘাবড়ে)

শ্রীপর্ণা: নাকি মেয়েদের সাথে কথা বলতে গেলেই তুমি তোতলাতে শুরু করে দাও। কি?

কুন্তল: হাই! আমি কুন্তল। আমি না একটু আসছি, ওকে। তোরা কথা বল, ওকে।

(প্রথম আলাপ তো হয়ে গেল, তারপর কলেজের ছেলেমেয়েরা কি করবে কোথাও এদিক সেদিক ঘুরতে যাবে। সেটাও প্রথমবার বলতে হয়েছিল শ্রীপর্ণাকে, শুধু তাই নয় হাঁটতে হাঁটতে আলতো ছোঁয়ায় শতদ্রুর আঙুলের ফাঁকে আঙুল গলিয়ে দেয় শ্রীপর্ণা। উত্তেজনায় সে দিন শতদ্রুর হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাওয়ার উপক্রম। হয়তো আপনি এখন ভাবছেন এইরকম একটা ব্যাবলা, বোকা মার্কা ছেলেকে কারোর কেন পছন্দ হবে, মানে ইংরেজিতে "What does she see in this guy? সবার একটা না একটা সুপার পাওয়ার থাকেই, শতদ্রুও আছে। শ্রীপর্ণা সেটারই আবিষ্কার করে একদিন ক্যান্টিনে। )

শ্রীপর্ণা: তুমি রাত-দিন কী কর বলতো এই ল্যাপটপটাকে নিয়ে? যখনই দেখি ক্যান্টিনে বসে কি ছাইপাশ ছবি এডিট করো লুকিয়ে লুকিয়ে? কলেজে তো কোন প্রজেক্ট দেয়নি এখনো।

শতদ্রু: না না কিছু না। এমনি ওই আর কি।

শ্রীপর্ণা: কিছু না? কই দেখিতো ল্যাপটপটা দাও এদিকে।

(দুজনের মধ্যে কাড়াকাড়ি শুরু হয়)

শ্রীপর্ণা: ওরে বাবা। এতো অসাধারণ সব ছবি, তুমি তো খুব ভালো ফটোগ্রাফি করো। তোমার ওই সাধারণ একটা ক্যামেরায় এত ভালো ছবি তোলো সেটাতো আগে জানতাম না। আরে এতো আমার নামে ফোল্ডার (কিছুটা থেমে) এসব তো আমার ছবি। এই শ'তিন কের বেশি ছবি তুমি আমাকে না বলে কখন তুলেছ। তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে আমার ছবি তলো?

শতদ্রু: হ্যাঁ, মানে, sorry গো sorry!

শ্রীপর্ণা: sorry? শতদ্রু these are fantastical

শতদ্রু: (ব্যাবলার মতন করে) তাই তোমার ভাল লেগেছে?

শ্রীপর্ণা: আচ্ছা! তুমি ফটোগ্রাফির শিখলে কোথা থেকে?

শতদ্রু: আসলে বলতে পারো এটা আমার একটা শখ! মাধ্যমিক পাস করার পর মা আমাকে এই ক্যামেরাটা কিনে দিয়েছিল, সারাক্ষণ সঙ্গেই থাকে এটা। তারপর কিছুটা YouTube থেকে বাকিটা photo exhibition follow করে। সেই শখ ও ইচ্ছা থেকেই আমার ফটোগ্রাফির শুরু। ছবির আসল ব্যাপার কি জানো তো?

শ্রীপর্ণা: আলো।

শতদ্রু: হ্যাঁ, আলো না থাকলে ছবিত্তি নেই। আর আলো যখন আছে তা কি রকম আলো? কোন দিক থেকে পড়ছে? তার উপর নির্ভর করে ছবি কেমন হবে।

শ্রীপর্ণা: আচ্ছা। (গালে হাত দিয়ে, মন দিয়ে)

শতদ্রু: হ্যাঁ। এই যে তুমি Insta-তে ছবি দাও, ছবি তোলো, মানে ফটোগ্রাফি, ফটোগ্রাফি মানে কি জানো?

শ্রীপর্ণা: কি?

শতদ্রু: দুটো গ্রিক কথা, ফোটো মানে আলো, গ্রাফিন মানে লেখা। অর্থাৎ ফটোগ্রাফি মানে আলো দিয়ে লেখা। আসলে ফটোগ্রাফি আসে মূলত কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করে, so photography you say is a interesting subject. Ok. দুম করে গলায় ক্যামেরা ঝোলালেই ফটোগ্রাফার হওয়া যায় না।

(সেদিন রাতে শ্রীপর্ণার পরিচয় হলো একটি নতুন ছেলের সাথে, যে ছেলেটা তার সাথে ক্লাস করে, যে ছেলেটা ক্যাবলা, যে ছেলেটা ঠিক করে কথা বলতে পারেনা, সেই ছেলে আর এই ছেলে যেন দুটো আলাদা মানুষ। এই ছেলেটা প্রচন্ড কনফিডেন্ট, যে নিজের সাবজেক্ট সম্বন্ধে সবকিছু জানে। কথা বলতে গেলে তোতলায় না এবং এই ছেলেটার ভেতরে একটা আগুন আছে, সম্ভাবনার আগুন, বলা যায় এখান থেকেই শ্রীপর্ণার প্রেমে পড়া শুরু। আসলে প্রপোজটাও করেছিলো শ্রীপর্ণাই তাও আবার দুর্গা পূজোর পঞ্চমীর দিন রাতের বেলা।)

(ফোনে কথা-বার্তা চলছে। শতদ্রু পাড়ার পুজোর কাজ সেরে বাড়ি ফিরছে)

শ্রীপর্ণা: হ্যালো ঘুমিয়ে পড়েছিলেন?

শতদ্রু: না না বলো।

শ্রীপর্ণা: ব্যস্ত নাকি পুজোর কাজে?

শতদ্রু: না না সব সেরে এইতো জল খাচ্ছিলাম বলো।

শ্রীপর্ণা: শোনো না! আমার একটা কথা বলার আছে তোমাকে।

শতদ্রু: হ্যাঁ বলো।

শ্রীপর্ণা: I love you (হঠাৎ করে বলে উঠলো)

(শোনা মাত্রই শতদ্রু বিষম খেয়ে নাজেহাল অবস্থা, শ্রীপর্ণা হেসে কুটিপাটি। )

শ্রীপর্ণা: বাবা রে। আমি কি বললাম, আর কি রিয়াকশন পেলাম, আহা! আচ্ছা I love you এর উত্তরে বিষম। কেন তুমি কি আমায় এতটা অপছন্দ করো?

শতদ্রু: না না মানে, আমিও তোমাকে, ইয়ে। ( কাশিটা সামলাতে সামলাতে)

শ্রীপর্ণা: ও ভগোবান। আচ্ছা তাহলে কাল ষষ্ঠী আর কাল থেকে আমরা official girlfriend boyfriend আপত্তি নেই তো কোন? ভেবে নাও। তারপর আবার কদিন পরে pol science-এর সায়ন্তনী কে বেশি পছন্দ হলে আমাকে ল্যাং মারবে নাতো?

শতদ্রু: এই। কি যে বলোনা তুমি......

দেখলেন তো এমনও সম্পর্ক হয়, আমরা ভালোবাসার মানে বুঝি সব সময় ছেলেরাই এগিয়ে আসবে, প্রপোজ করবে তা কিন্তু নয়। আসলে মনের মিলটাই সব থেকে বড় ব্যাপার। কে প্রপোজ করল, আর কে আগে প্রপোজ করল, এটা কোন ভাবেই বড় হতে পারে না। দুজনের আন্ডারস্ট্যান্ডিং দুজনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, সাইকেলের মত, যেখানে প্যাডেল করলে একটি মাত্র চাকাই এগোনোর দায়িত্বটা নেয় আর সাথে চলে দুটো চাকাই।

***

--সুপর্না কামাতি

# ভারতীয় দর্শনের উৎপত্তি

সঙ্গীতা মন্ডল

দর্শন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত কিন্তু আমাদের জ্ঞানের অভাবের জন্য আমরা তাকে উপলব্ধি করতে পারিনা ।দর্শন আমাদের মধ্যে বিচার ক্ষমতা জাগ্রত করে, যার সাহায্যে আমরা ভালো- মন্দ, ন্যায়- অন্যায়, নৈতিক - অনৈতিক মূল্য বিচার করতে পারি। সুতরাং দর্শন বা Philosophy বিষয়টিকে শুধুমাত্র একটি পাঠ্য বিষয় হিসেবে নির্বাচন করা হয় না, এটি মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের জীবনের প্রয়োজন বোধ থেকেই দর্শনের উৎপত্তি হয়েছে। দার্শনিক চিন্তার মুলে রয়েছে জগৎ ও জীবনকে বোঝার চেষ্টা এবং পৃথিবীতে নিজের স্থান নির্ণয়ের অদম্য আকাঙ্ক্ষা। দর্শন কি? দার্শনিক কাদের বলা হয়? এই সমস্ত বিভিন্ন প্রশ্ন আমাদের মনে উদয় হয় । সাধারণত ইংরেজি'Philosophy' শব্দের প্রতিশব্দ রূপে 'দর্শন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ইংরেজি 'Philosophy' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ' বা 'love of wishdom'। 'Philosophy' শব্দটি দুটি গ্রিক শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে - একটি হল 'Philos'যার অর্থ হল আগ্রহ বা অনুরাগ বা love এবং অপরটি হল 'Sophia'যার অর্থ হলো জ্ঞান বা প্রজ্ঞা বা love of knowledge। 'দৃশ'ধাতুর উত্তর 'অনট' প্রত্যয় করে 'দর্শন' শব্দটির উৎপত্তি। এবং এই 'দৃশ' ধাতুর বাংলা অর্থ হল 'দেখা'। সুতরাং 'দর্শন' কথাটির সাধারণ অর্থ হল 'দেখা' বা 'প্রত্যক্ষ করা'। কিন্তু আমরা কখনই যেকোনো দেখাকেই 'দর্শন' নামে অভিহিত করতে পারিনা। ভারতীয় মতে 'দর্শন'বলতে বোঝায় আত্মদর্শন অর্থাৎ আত্মাকে দেখা বা জানা। এখানে আত্মা বলতে কোন ভূত - প্রেত আত্মার কথা বলা হয়নি, আত্মা বলতে মানুষের মনের মধ্যে যে সত্তা আছে সেই সত্তা কে বোঝানো হয়েছে। আত্মাকে দেখা বা জানার অর্থ হল আত্মাকে উপলব্ধি করা। কাজেই 'দর্শন' হল সত্য বা তত্ত্বকে দেখা এবং এর স্বরূপ উপলব্ধি করা। এই কারণে ভারতীয় মতে 'দর্শন' হল সত্যের সাক্ষাৎ উপলব্ধি আর দার্শনিক হলেন সত্যদ্রষ্টা বা তত্ত্ব জ্ঞানী অর্থাৎ যিনি সত্য বা তত্ত্বকে জীবনে উপলব্ধি করেছেন।

এখন প্রশ্ন হল দর্শন কি নিয়ে আলোচনা করে? দর্শনের উৎপত্তি কিভাবে হল ? - সাধারণ মানুষের কাছে দর্শন মানেই যা ভূত, প্রেত, আত্মা, ঈশ্বর, পুনর্জন্ম, কর্মফল ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে কিন্তু এই কথাটি ঠিক নয়। দর্শন একদিকে যেমন বিভিন্ন তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করে তেমনই তার প্রয়োগ সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে। দর্শন কোনো নির্দিষ্ট একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে না। দর্শন যেমন অধিবিদ্যা অর্থাৎ ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তেমনই আবার সমাজের বহুল চর্চিত বিষয় এবং পরিবেশ নীতিবিদ্যা সম্পর্কেও আলোচনা করে।

আমাদের সাধারণ মানুষের মনে বিভিন্ন প্রশ্নের উদয় হয়, জীবন কি? মৃত্যু কি? এবং এই জগৎ কোথা থেকে এলো? - এই সমস্ত অসংখ্য প্রশ্ন যখন মানুষের মনকে অস্থির করে তোলে এবং জগৎ এবং জীবন সম্বন্ধে যখন এইসব প্রশ্ন যুক্তিসঙ্গত উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে তখনই দর্শনের উদ্ভব হয়। গ্রিক দার্শনিক প্লেটো বলেছেন বিস্ময় বোধ থেকেই দর্শনের উৎপত্তি। আবার ফরাসি দার্শনিক রেনে দেকার্তের মূল বক্তব্য হল 'আমি চিন্তা করি অতএব আমি আছি' (I think, therefore I exist : 'Cogito Ergo Sum') ।তিনি বলেছিলেন, এই পৃথিবীর সবকিছুকে সন্দেহ করা যায় কিন্তু যে সন্দেহ করছে

অর্থাৎ সন্দেহ কর্তাকে কখনোই সন্দেহ করা যায় না। 'আমি সন্দেহ করছি' মানে 'আমি চিন্তা করছি' আর 'আমি চিন্তা করছি' মানে 'আমি আছি' অর্থাৎ আমি একজন অস্তিত্বশীল জীব। সুতরাং দেকার্ত বলেন, Philosophy begins in doubt অর্থাৎ সংশয় থেকেই দর্শনের শুরু।

মানুষ জগৎ এবং জীবনকে জানতে চায়, জগৎ ও জীবনের স্বরূপ বুঝতে চায়। জগতের বিভিন্ন ঘটনা তাদের কাছে রহস্যময়, তাই তারা সব কিছুতেই বিস্ময় প্রকাশ করে। এই বিস্ময় থেকেই জিজ্ঞাসার জন্ম হয়।আর মানুষের এই জিজ্ঞাসা পরিতৃপ্ত করে দর্শন।

'দর্শন' এবং 'Philosophy'শব্দকে সমতুল্য বলা হলেও এই দুটি শব্দ সম্পূর্ণ সমার্থক নয়। ভারতীয় দর্শন গভীরভাবে আধ্যাত্মিক এবং তা সর্বদাই তত্ত্ব উপলব্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। ভারতীয় দর্শনে 'দর্শন' শব্দ তত্ত্ব দর্শন বা Vision of truth ও তত্ত্ব দর্শনের উপায় অর্থাৎ Instrument of vision of truth কে বোঝায়, মানুষের নানা দুঃখ যেমন রোগ, শোক, জরা, বার্ধক্য,মৃত্যু ভারতীয় দার্শনিকদের চিন্তিত করেছিল, তাই তারা দুঃখ নিবৃত্তির উপায় অনুসন্ধানে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। আধ্যাত্মিক দুঃখ (শারীরিক ও মানসিক দুঃখ), আধিভৌতিক দুঃখ (প্রাকৃত কারণ থেকে উদ্ভূত শারীরিক ও মানসিক দুঃখ) এবং আধিদৈবিক দুঃখ (অপ্রাকৃত কারণ থেকে উদ্ভূত শারীরিক ও মানসিক দুঃখ) - এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ ভারতীয় দর্শন চিন্তার লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার একমাত্র উপায় হল realisation of truth বা সত্যোপলব্ধি। অর্থাৎ ভারতীয় দর্শন হল সত্যোপলব্ধির দর্শন। এই ভারতীয় দর্শন হল দর্শনেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা।

ভারতীয় দর্শন বলতে আবার প্রমাণ শাস্ত্র কেউ বোঝানো হয় ।প্রমাণ শাস্ত্র হল সেই শাস্ত্র, যে শাস্ত্রে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ প্রভৃতি প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করা হয়। ভারতীয়রা জ্ঞানকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন- একটি হল পরা জ্ঞান যার অর্থ হল শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, যার দ্বারা আত্মাকে দর্শন করা যায়। আর অপরা জ্ঞান কেবলমাত্র বুদ্ধির সাহায্যে লাভ করা যায়। সুতরাং ভারতীয় মতে দর্শন বলতে বোঝায় কেবলমাত্র সত্যকে জানা নয়, সত্যকে দর্শন করা, এবং এই সত্য দর্শন হল পরা জ্ঞান লাভ।

ভারতীয় দর্শন হল সত্যোপলব্ধির দর্শন। মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য পুরুষার্থ ভোগ নয়, ত্যাগ নয়, বৈরাগ্য ও অনাসক্তি। অমৃত প্রাপ্তি বা মোক্ষ প্রাপ্তি হল মুখ্য পুরুষার্থ। বৈদিক যুগের পরে মহাভারত প্রভৃতি পুরাণের যুগে মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য একটি আচরণবিধির প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এই আচরণবিধির আদর্শ বেদ এবং উপনিষদে বিধৃত। কিন্তু এই যুগে সেই আদর্শকে মানবজীবনে রূপায়নের জন্য বিশেষ বিশেষ পথের নির্দেশ দেওয়া হয় । এই যুগে জীবনের প্রকৃত আদর্শকে চারটি মানবিক মূল্যবোধের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করতে বলা হয়েছে, এই মূল্যবোধ গুলিকে বলা হয় 'পুরুষার্থ' বা 'value of life' ।

দর্শন আলোচনা মোক্ষ বা অমৃত লাভের উপায়, পার্থিব বন্ধনের কারণ মিথ্যা জ্ঞান, তাই তত্ত্ব জ্ঞান বা সত্যোপলব্ধি মুক্তি লাভের উপায়। আত্মা সত্য কারণ আত্মা নিত্য, তাই উপনিষদে বারবার ধ্বনিত হয়েছে " আত্মা কে জানো"

- " আত্মানং বিদ্ধি" । তাই যাগ্যবল্ক্য মৈত্রীকে অমৃত লাভের জন্য বলেন আত্মাকে দর্শন কর, শ্রবণ কর, মনন কর, ধ্যান কর,
- " আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যোনিদির্ধ্যাসিতব্যো" - বৃহদারণ্যক উপনিষদ।

মূলত বেদকে ভিত্তি করেই ভারতীয় দর্শন চিন্তার উদ্ভব হয়েছিল। হিন্দু ধর্ম ও দর্শন চিন্তার সমস্ত বিষয়ের সর্বোচ্চ প্রামাণ্য বেদ নির্ভর। 'বেদ' শব্দের মুখ্য অর্থ হল 'জ্ঞান', 'অতীন্দ্রিয় প্রজ্ঞা'। গৌণ অর্থে বেদ বলতে সেই শব্দসমূহকে বোঝায় যাতে অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিধৃত হয়ে আছে। সুতরাং ভারতের ধর্মীয় দার্শনিকগন শুধুমাত্র প্রজ্ঞাকেই বোঝায় না, সেই গ্রন্থসমূহকেও বোঝায় যাতে এই প্রজ্ঞার প্রাচীনতম উক্তি সমূহ বিধৃত হয়ে আছে।

ভারতীয় দর্শনের উৎসরূপে উপনিষদের গুরুত্বকেও অস্বীকার করা যায় না। হিন্দু চিন্তায় এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ নেই যা মূল উপনিষদে পাওয়া যায় না। পরবর্তী সমস্ত ভারতীয় দর্শনই প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে তাদের মতবাদ উপনিষদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ । এর থেকে উপনিষদের গুরুত্ব বোঝা যায়।

সাধারণত বেদের ওপর ভিত্তি করেই ভারতীয় দর্শন কে দুটি সম্প্রদায়ে বিন্যস্ত করা হয়। একটি হল আস্তিক দর্শন সম্প্রদায় বা Orthodox এবং অপরটি হল নাস্তিক দর্শন সম্প্রদায় বা Heterodox। সাধারণত আস্তিক বলতে ঈশ্বরে বিশ্বাসী এবং নাস্তিক বলতে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী ব্যক্তি কে বোঝায়। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে যারা বেদকে প্রমাণ বলে স্বীকার করেন তাদের আস্তিক নামে অভিহিত করা হয়। যেমন সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত - এই ষড়দর্শন আস্তিক দর্শন নামে অভিহিত কেননা এইসব দর্শনে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয়েছে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করেও যদি কোন দর্শন সম্প্রদায় বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে তবে তা আস্তিক দর্শন বলে গ্রাহ্য হবে। যেমন সাংখ্য ও কর্ম- মীমাংসা দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়নি কিন্তু তারা আস্তিক দর্শন- এর অন্তর্গত। মীমাংসা সম্প্রদায় কর্মকাণ্ডের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং বৈদিক ক্রিয়া-কলাপকে দার্শনিক দিক থেকে সমর্থন করার চেষ্টা করে । এবং বেদান্ত দর্শন সম্প্রদায় জ্ঞানকাণ্ডকে গুরুত্ব দেন এবং বৈদিক চিন্তার উপর ভিত্তি করে তাদের দর্শন গড়ে তোলেন। সাংখ্য, যোগ, ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শন সাক্ষাৎ ভাবে বেদ নির্ভর নয় কিন্তু তারা বেদের প্রামাণ্যের বিরোধিতা করেন না। তারা স্বতন্ত্র যুক্তির মাধ্যমে তাদের দার্শনিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে তাদের সিদ্ধান্তগুলি বেদের প্রামাণ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। অপরদিকে যারা বেদকে প্রমাণ বলে স্বীকার করেন না তাদের নাস্তিক সম্প্রদায় নামে অভিহিত করা হয়। যেমন চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায় নাস্তিক দর্শন সম্প্রদায়। চার্বাক জড়বাদী কিন্তু জৈন এবং বৌদ্ধ দর্শন নাস্তিক হলেও অধ্যাত্মবাদী কারণ তারা কর্মবাদ, পরলোক ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী এবং মুক্তিকে তারা পরম পুরুষার্থ বলে স্বীকার করেন। কিন্তু চার্বাক দর্শন এই সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করে বলেই চার্বাক দর্শনকে জড়বাদী দর্শন সম্প্রদায় বলা হয়।

আমাদের সাধারণ মানুষের জীবনে মৃত্যু, রোগ, শোক, প্রিয়বিয়োগ প্রভৃতি দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। সুখ থাকলে দুঃখ থাকবেই। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বলেছেন আমাদের জীবনে বিনা কারণে দুঃখ হয় না ।দুঃখ আছে মানে দুঃখের কারণ আছে এবং এর কারণ কি জানতে পারলে আমরা দুঃখকে নিরোধ করতে পারব এবং নির্বাণ প্রাপ্তি লাভ করতে পারব। এই দুঃখ নিরোধের কতগুলি উপায়ের কথা তিনি নির্দেশ করেছেন যেগুলি অষ্টাঙ্গিক মার্গ নামে পরিচিত। এই মার্গে বলা হয়েছে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ ও হিংসা পরিত্যাগ

করতে হবে, মিথ্যা কথা বর্জন করতে হবে, ব্রহ্মচর্য পালন, সত্য ও প্রীতিপূর্ণ কথা বলতে হবে, মনকে সৎ চিন্তার দ্বারা পরিপূর্ণ করতে হবে, দেহ ও মনের অনিত্যতা অর্থাৎ আত্মা বলে শাশ্বত কোন সত্তা নেই - এগুলো প্রতিনিয়ত মনে রাখতে হবে। কিন্তু আমাদের সাধারণ মানুষের পক্ষে কখনোই এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ অবলম্বন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।ভারতীয় দর্শন এই নির্বাণ প্রাপ্তি বা মোক্ষ লাভের উপায় নিয়েই আলোচনা করে।

ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল এরা কর্মবাদে বিশ্বাসী। কর্মবাদের মূল কথা হল - প্রতিটি কাজ তার ফল উৎপাদন করবে, ভালো কাজের ফল ভালো, মন্দ কাজের ফল মন্দ। কর্ম করলে তাকে ফল ভোগ করতেই হবে কিন্তু আমরা কখনো কখনো দেখতে পাই ভালো কর্ম করেও কেউ মন্দ ফল পাচ্ছে আবার মন্দ কর্ম করেও কেউ ভালো ফল পাচ্ছে। এগুলি নিয়ে দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা নীতিবিদ্যায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। পূর্ব জীবনের কর্মফল মানুষ এই জীবনে ভোগ করে আবার পূর্ব জীবনের কর্ম অনুসারে এই জীবন নির্ধারিত হয় আবার এই জীবনের কর্ম অনুসারে পরবর্তী জীবন নির্ধারিত হয় এই ভাবেই কর্মনীতি চলতে থাকে। এই কর্মবাদ আমাদের মানুষের জীবনের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। সুতরাং দর্শনে ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

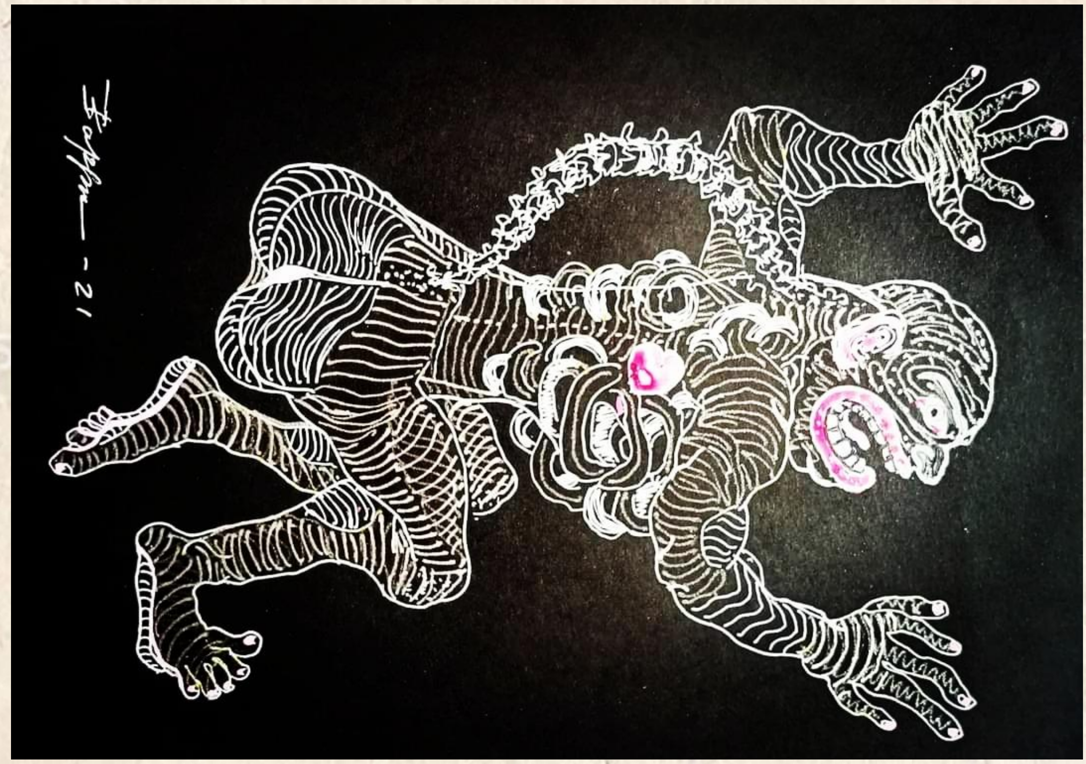

বাপ্পা ভৌমিক

বই
কুটির
কলকাতা

শারদ সংখ্যা
১৪২৯

# বাংলা ও বাঙালির সংস্কৃতি ,ধর্ম , সাহিত্য ও সামাজিক জীবনের উৎপত্তি ও বিবর্তন

রবিন মুখার্জি

সংস্কৃতি বলতে সাধারণত যে বিষয়টি আমাদের মনের মধ্যে আসে তা হল কোন একটি বিশেষ সমাজের সাহিত্য, সংগীত, ললিত কলা, ক্রীড়া, মানবিকতা, জ্ঞানের উৎকর্ষ ও আরো অনেক শান্তি ও সৌন্দর্য সমাহার।

আবার যদি আমরা একে ব্যাপক দৃষ্টি দিয়ে দেখি তাহলে সংস্কৃতি হল মানুষের জ্ঞান, আচার-আচরণ, বিশ্বাস, রীতিনীতি, নীতিবোধ, চিরাচরিত প্রথা, সমষ্টিগত মনোভাব, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং অর্জিত কৃতি সমূহ।

বাঙালি সংস্কৃতি যেহেতু বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলা ভাষীদের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা, সেহেতু এই সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে ‘বাঙালা’ নামে একটি স্বতন্ত্র অঞ্চল গড়ে উঠেছিল, তবে এটাও সত্য বাংলা সংস্কৃতির ভিত্তি সুলতানি আমলের বাংলা রাজ্য অথবা বাংলা ভাষা গড়ে ওঠার আরো অনেক বছর আগেই গড়ে উঠেছিল।

বাঙ্গালা নামে পরিচিত এই বিরাট অঞ্চলটি গড়ে উঠেছিল অনেকগুলি রাজ্য গৌড়, রাঢ়, সুক্ষম, বরেন্দ্রী, হরিকেল, _সমতট এবং বঙ্গ কে নিয়ে। পরবর্তীকালে আরো অনেক ছোটখাটো রাজ্যও এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। তবে ১৩৫০ এর দশকে গৌড়ের সুলতান _শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ সোনার গাঁ জয় করে 'শাহ -ই বাঙালিয়ানা' অর্থাৎ বাঙ্গালীদের শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। তখন থেকেই এই বৃহত্তর ‘বাঙ্গালা’ র জন্ম হয়েছিল ইতিহাসবিদদের মতে।

ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য সংস্কৃতির সঙ্গে যথেষ্ট মিল থাকলে বঙ্গীয় সংস্কৃতি ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এর কারণ হিসেবে মনে হয় বঙ্গভূমির ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য এবং বিবিধ নৃতাত্ত্বিক সংমিশ্রনের ফলে এর সংস্কৃতি নিজস্বতা লাভ করেছে। তদুপরি এর অবস্থান দীর্ঘদিনের শাসন কেন্দ্র দিল্লি থেকে শত শত মাইল দূরে, উপরন্ত ধর্ম, দর্শন ও ধারণা, সাংস্কৃতিক ধারা ও শাসন কাঠামো যা কিছু এই প্রান্তিক ভূখন্ডে আসিয়াছে, তাহা অল্পকালের মধ্যে বঙ্গীয় চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

তাহা ছাড়াও জালের মতন বিস্তৃত নদী শাখা নদী এবং বনভূমি পরিপূর্ণ বঙ্গদেশ আবার বহু ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। ফলে এসব অঞ্চলেও সংস্কৃতি খানিকটা স্বতন্ত্র লাভ করেছে।

বঙ্গভূমির অবস্থান যেহেতু বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন এবং ইসলাম ধর্মের মত প্রধান প্রধান ধর্মের উৎপত্তি স্থান থেকে বহু দূরে ছিল সেই কারণে এইসব ধর্মের কোনটাই তার আদি এবং অকৃত্রিম রূপ এই অঞ্চলে পৌঁছায়নি।

তবুও এসব বহিরাগত ধর্মের সঙ্গে স্থানীয় ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আচারের সমন্বয়ে ঘটেছে। এই ভাবে বঙ্গদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন এবং ইসলাম ধর্ম যেমন বঙ্গীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, তেমনি বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যেও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান এবং সামাজিক রীতিনীতির কিছু মিল লক্ষ্য করা যায়। সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পর্যটক হিউয়েন- সাং লিখেছেন যে, তিনি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী

স্থানীয় লোকদের ধর্মীয় দর্শন, আচার-আচরণ এবং সামাজিক রীতিনীতিতে অনেক সাদৃশ্য দেখেছেন। তিনি আরো লক্ষ্য করেন যে, বঙ্গীয় বৌদ্ধ ধর্ম মূল বৌদ্ধ ধর্ম থেকে অনেকটাই আলাদা।

বঙ্গদেশে সবচেয়ে পুরানো রাজা ছিলেন শশাঙ্ক, সপ্তম শতাব্দীর এই রাজা ছিলেন হিন্দু, অপরপক্ষে বৌদ্ধ ধর্ম পাল রাজাদের রাজত্বে আরম্ভ হয় অষ্টম শতাব্দীতে।

রাজা শশাঙ্ক কেবল হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না, তিনি বৌদ্ধদের উপর নির্যাতনও চালিয়েছিলেন।

অপরপক্ষে পাল রাজারা কয়েক শতাব্দী ধরে বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষনা করলেও হিন্দুদের উপর নিপীড়ন করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। পালদের পর যে সেন বংশ ক্ষমতায় বসেন। তারা হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষন করেছিল এবং বৌদ্ধরা তাদের আমলে নির্যাতিত হয়েছিল বলে প্রমাণ রয়েছে। সেন বংশের শাসনকালে বৌদ্ধ ধর্ম তার গৌরব হারায় এবং বৌদ্ধদের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পায়।

১২০৪ সালে লক্ষণ সেনকে লক্ষণ সেন কে পরাজিত করে বখতিয়ার খলজী মুসলিম শাসন প্রবর্তন করলে বাংলায় ধর্মীয় পরিবর্তনের একটি বড় ঢেউ আসে। খলজির শাসনকালে বঙ্গভূমিতে অনেক মুসলিম ধর্ম প্রচারক এসেছিলেন এবং সুলতানের সহায়তায় তারা বহু স্থানীয় লোকেদের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করেছিলেন। এই সময় বৌদ্ধদের সংখ্যা খুবই হ্রাস পায় এবং হিন্দুদের মন্দির নির্মাণের কাজও সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়যায়, এবং হিন্দু ধর্মের নিচু সম্প্রদায়ের বহু লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। তার অন্যতম কারণ ইসলাম ধর্মে যে সামাজিক সাম্যের কথা বলা হয়েছে, তা বহু সংখ্যকের দীক্ষার কারণ ছিল। যদিও বলপূর্বক করেও অনেক কে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছিল।

বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের এই সংকটকালে ষোলো শতকের গোড়ায় চৈতন্য দেব (১৪৮৬-১৫৩৩) এর আবির্ভাব ঘটে এবং ভক্তি ও প্রেমের আদর্শের উপর ভিত্তি করে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন এবং বহু মানুষ তার প্রেম ও ভালোবাসায় আকৃষ্ট হয়ে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। এই বৈষ্ণব ধর্ম কেবল হিন্দু ধর্মকে ইসলামের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেনি বরং পরবর্তী দুশ শতাব্দী ধরে বৈষ্ণব ও সামগ্রিক হিন্দু ধর্ম চর্চায় এক নতুন জোয়ার এনেছিল। এছাড়া এর প্রভাবে সহজিয়া, বাউল এবং কর্তা-ভজার মত ভক্তি সম্প্রদায়ের জন্ম দেয়। এইসব সম্প্রদায় প্রথমেই জাতিভেদকে অস্বীকার করে। বঙ্গভূমির বিচিত্র ধর্ম গুলির যদি কোন মিল থেকে থাকে, তাহা হলো এই গোড়ামী বর্জিত নমনীয়তা এবং সমন্বয় ধর্মী ভক্তিবাদ।

বাংলা ভাষা পৃথিবীর মধ্যে চতুর্থ সর্ব বেশি প্রচলিত ভাষা। এই ভাষা ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর অন্যতম ভাষা। বাংলা ভাষা বঙ্গভূমির আদি ভাষা ছিল না সেই সময় বিভিন্ন অঞ্চলে আদিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত ছিল। আর্যরা সঙ্গে নিয়ে আসে পূর্বাঞ্চলের প্রাকৃত ভাষা। বৌদ্ধরা এনেছিলেন পালি ভাষা। যা প্রাকৃতের মত সংস্কৃত ভাষারই একটি মৌখিক রূপ। বহু শতাব্দী ধরে উচ্চারণ ও ব্যাকরণগত বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এই প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষা এক স্বতন্ত্র রূপ লাভ করেছে।

এই ভাষার আদি রূপ খানিকটা পাওয়া যায় দশম শতাব্দী থেকে রচিত চর্যাপদে। তবে বাংলাভাষা তখনও একেবারে আলাদা ভাষা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেনি। মিশেছিল অহমিয়া ও উড়িয়া ভাষার সঙ্গে। তাই সঠিকভাবে বললে বলতে হয় চর্যাপদে যে বাংলা দেখা যায়, তা প্রাক বাংলা আনুমানিক পনেরো শতকে রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন খাঁটি বাংলা ভাষায় আদি তম নিদর্শন।

বাংলা ভাষা যেহেতু সংস্কৃত ভাষায় মৌখিক রূপ প্রাকৃত থেকে উৎপন্ন। সেই কারণে এই ভাষার শব্দগুলির প্রধান ভাগই হয় সংস্কৃত। যেমন সংস্কৃত শব্দের বিবর্তন রূপ 'চন্দ্র থেকে চাঁদ'।

স্থানীয় ভাষার কিছু বৈশিষ্ট্য ও বহিরাগত বাংলাকে প্রভাবিত করেছে। মুসলিম শাসন বাংলা ভাষাকে প্রভাবিত করেছিল দুভাবে, প্রথমত এই সময় বাংলা ভাষায় হাজার হাজার আরবি, ফারসি শব্দ ঢুকে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ যে বাংলা ভাষাকে ব্রাহ্মণরা ঘৃণা করেছেন। সুলতানরা পনেরো শতক থেকে বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষনা করতে আরম্ভ করেন।

সতেরো বা আঠারো শতকে পর্তুগিজ শব্দও বাংলা ভাষায় এসে যায়। বিদেশি ভাষার ঢেউ আর একবার বাংলা ভাষায় লাগে। ব্রিটিশ রাজত্ব স্থাপিত হওয়ার পর এবং সেই সুবাদে এখন বাংলায় কয়েক হাজার ইংরেজি শব্দ প্রতিদিনের শব্দে পরিণত হয়েছে। বাক্য গঠনে এবং যতি চিহ্নেও (যেমন কমা, সেমিকোলন, আশ্চর্যবোধক চিহ্ন) ইংরেজি ভাষার প্রভাব বলে পরিগণিত হয়।

আঠারো শতকের শেষ কয়েক দশক ধরে বাংলা ভাষাকে সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে দেবার জন্য ইংরেজ প্রশাসক আইন আদালতের ভাষা ফারসিকে সরিয়ে বাংলা ভাষাকে ব্যবহারের চেষ্টা করেছিল।

বাঙালি সংস্কৃতির অন্যান্য দিকের মত বাংলা ভাষাও নমনীয় ও সমন্বয় ধর্মী। তবে বাংলা ভাষার চর্চা আরো ব্যাপক হারে ছড়িয়েছিল আঠারো শতকের শেষের দিকে ছাপাখানা প্রবর্তিত হওয়ার পর।

সাহিত্য চর্যাপদ কে বাংলার জনজীবনে একটি বিশেষ দিক রূপে গণ্য করলে বাংলা সাহিত্যের ঐশ্বর্য মন্ডিত ঐতিহ্য প্রায় হাজার বছরের। অন্যান্য ভাষার সাহিত্যের মত বাংলাও তার যাত্রা শুরু করেছিল ধর্মীয় কাব্য দিয়ে। আরো সঠিক করে বললে, ভক্তিবাদী গান দিয়ে চর্যাপদ থেকে আরম্ভ করে মধ্যযুগের বিশাল সাহিত্য ভান্ডার এর প্রায় সবটাই হলো ঈশ্বর মুখী। এবং এর মধ্যে ছিল বৌদ্ধ, হিন্দু এবং মুসলমানদের ধর্মীয় সাহিত্য। ব্যতিক্রম দেখা যায় শাহ মোহাম্মদ সগীর, দৌলত কাজী এবং তাদের রোমান্টিক কাব্যে। হিন্দু কবিরা তাদের রোমান্টিক অনুভূতি, আবেগ এবং অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন রূপকের মাধ্যমে কেবল রাধা কৃষ্ণের প্রেমের কাহিনী নিয়ে রচিত বৈষ্ণব সাহিত্য। বস্তুত উনিশ শতকের আগে পর্যন্ত বাঙালি কবিরা নিজেদের মনের কথা বলতে গেলে প্রকাশই করেননি।

এরপর উনিশ শতকে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব বাঙালি কবি এবং লেখকরা মানবতা এবং নিজেদের ব্যক্তিগত আবেগ ও অনুভূতিকে তাহাদের লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। এই নতুন সাহিত্য ঈশ্বর মুখী নয়, মানবমুখী। সাহিত্যের বিষয়বস্তু এবং মূলভাব ধারাই এ সময়ে বদলে যায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এটা একটা যুগান্তর। এই মানববাদী নতুন সাহিত্য দিয়ে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সূচনা হয়। এতে বিরাট অবদান রয়েছেন ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাহিত্যের আরেকটি ঐতিহাসিক বিকাশ লক্ষ্য করা যায় তার আঙ্গিকের ক্ষেত্রে। মধ্যযুগে রচিত হয়েছিল কেবল আখ্যানমূলক কাব্য। কিন্তু উনিশ শতকে ইংরেজি সাহিত্য থেকে নতুন আঙ্গিক নিয়ে লেখা হয় মহাকাব্য, পত্র কাব্য, সনেট, খন্ড কবিতা, নাটক,

উপন্যাস, ছোট গল্প এবং প্রবন্ধ। আর বিশ শতকে এসে বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের হাতে আরও উন্নত মানের সাহিত্য রচিত হয় এবং তা বিশ্বমানের মর্যাদা লাভ করেছিল।

বাংলা সামাজিক জীবনে যে বর্ণভেদ প্রথা ছিল তাহা কেবল ধর্মীয় ব্যবস্থা নয় বরং সমাজ কাঠামোর উপরও তা গুরুতর প্রভাব ফেলেছিল। জীবিকার জন্য একজন ব্যক্তি কি করিবে সামাজিক এই প্রথা স্থায়ীভাবে নির্ধারণ করে দিত। এই প্রথা অনুযায়ী জেলের বংশধরেরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম জেলে হবে, একইভাবে নাপিতের বংশধরেরা নাপিত, জোলার বংশধরেরা জোলা, ঝাড়ুদারের বংশধরেরা ঝাড়ুদার, বৈদ্যের বংশধরেরা বৈদ্য, এবং ব্রাহ্মণের বংশধরেরা ধর্ম কর্মে কাজ করবে বলে প্রত্যাশা করতো।

গ্রামের মুসলমানরাও মোটামুটি এই প্রথা পালন করতো। তাই তারা বেশিরভাগ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে কৃষি কাজে জড়িত ছিলেন। উপনিবেশিক আমলে এই কঠোর প্রথা শিথিল হতে থাকে এবং সমাজে সীমাহীন সচলতা আসে।

মুসলমান সহ সমাজের নিচের তলার লোকেরা কৌলিক বৃত্তির প্রতি আনুগত্য বসত দীর্ঘকাল ইংরেজি শিক্ষার দিকে এগিয়ে যাননি অথবা সেই সুবাদে নতুন যুগের সুবিধা গুলোর থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ফলে তারা শিক্ষা দীক্ষায় বর্ণ হিন্দু এবং উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়েন।

উপনিবেশিক আমলে বাঙালি সমাজের অগ্রগতি হয়েছিল অসমান ভাবে এবং প্রধানত সমাজের উপর তলার লোকেরাই এর ফলে উপকৃত হয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও উনি শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি অনেক দিকেই সৃজনশীলতার একটা অসাধারণ স্ফুরণ ঘটেছিল। বিশেষ করে ভাষা, সাহিত্য, সংগীত ও নাটক সহ প্রদর্শনমূলক শিল্পকলা, স্থাপত্য, ধর্ম ও সমাজ সংস্কার এমনকি অনেক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেও এই স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায়।

এই যে সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃজনশীলতার স্ফুরণ ঘটেছিল একেই বলে বঙ্গীয় রেনেসাঁস। এতে অবদান রেখেছিলেন হিন্দু জমিদার শ্রেণী এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ। এই রেনেসাঁসের প্রভাবে বাঙালিরা ধর্মনিরপেক্ষতা, যুক্তিবাদ, উদারনৈতিকতা, ব্যক্তি স্বতন্ত্র, এক কথায় আধুনিকতার ধ্যানধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

আধুনিক বাঙালিদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা এবং বিবাহ ও পরিবারের মতো সামাজিক প্রতিষ্ঠান গুলিও পশ্চিমা চিন্তাধারা প্রতি প্রভাবিত হয়েছিল। তখনকার সময় মহিলাদের অশিক্ষিত করে অন্তঃপুরে প্রায় বন্দি জীবনযাপনে রাখা হতো। আর বিবাহিত মহিলারা ছিল নিতান্তই সন্তান জন্ম দিয়ে পরিবার গড়ে তোলার এক প্রক্রিয়া।

ইংরেজি শিক্ষা এই পুরুষতান্ত্রিক চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। নগরে শিক্ষিত সমাজে নারী ও স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন ঘটেছিল এবং পর্দা প্রথা ও ধীরে ধীরে শিথিল হয়। এমনকি মেয়েদের পোশাকেও দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে উচ্চ শ্রেণীর নাগরিক সমাজে অনেক মহিলাই যথেষ্ট পরিমাণে আধুনিক হয়ে ওঠেন এবং পরিবারে মহিলাদের মর্যাদা বৃদ্ধি হয়েছিল।পরিবর্তিত পরিবেশে পরিবার, সমাজ এবং অর্থনীতিতে নারীরা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত।

এইভাবে বাংলা সমাজ জীবনে বিভিন্ন গোঁড়ামী, কুসংস্কার এবং নারীদের প্রতি যে অমর্যাদা ছিল তাহা অনেক পরিমাণে হ্রাস পেয়েছিল এবং পশ্চিমা ভাবধারার দ্বারা সমাজে অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল।

--বর্ষা মন্ডল

বই কুটির কলকাতা

শারদ সংখ্যা ১৪২৯

# অরণ্য অভিযান

সম্রাট বসু রায়

২০১৫ সালের দুর্গাপুজোর সময় আমরা কয়েকজন মিলে ঠিক করলাম একটা ট্রেকিং এ যাবো। ট্রেকিং বলতে বোঝায় কোনো জায়গা দিয়ে পায়ে হেঁটে যাওয়া। সেটা সাধারণত এমন জায়গা হয় যেখানে গাড়ি যেতে পারে না। সেটা পাহাড়ের কোনো দুর্গম জায়গাও হতে পারে আবার কোনো সমুদ্রের ধার বরাবরও হতে পারে অথবা কোনো মরুভূমির মধ্যে দিয়েও হতে পারে। রাস্তায় কখনো থাকার জায়গা থাকতেও পারে বা তাঁবু পেতে থাকতেও হতে পারে।

ট্রেকিং এ যাব তো ঠিক করলাম, এবার আসলো জায়গা বা রুট নির্বাচনের পালা। আমাদের হাতে সময় কম থাকার দরুন আমরা ঠিক করলাম যে কাছাকাছি কোথাও যেতে হবে। কয়েকটি জায়গার মধ্যে শেষ পর্যন্ত আমরা ন্যাওড়া ভ্যালি ন্যাশানাল পার্কে যাবো বলে মনস্থির করলাম। এই ট্রেক রুটটিকে নির্বাচনের কারণ হল যে আমরা খুব অল্প সময়েই ট্রেক শুরু করার পয়েন্টে পৌঁছাতে পারব এবং এই ট্রেকটি আমরা ৫ দিনে শেষ করতে পারবো। ন্যাওড়া ভ্যালিতে অনেকগুলি ট্রেক রুট আছে। রেচেলা টপ বা রেচেলা ডান্ডা হল ন্যাওড়া ভ্যালির সর্বোচ্চ পয়েন্ট সেখান থেকে তিনটি ট্রেক রুট তিন দিকে চলে গেছে। একটি চলে গেছে মুলখারকা গ্রাম হয়ে সিকিমের আরিতার লেক বা লামপোখরির দিকে। অপর একটি টোডে গ্রাম হয়ে ডুয়ার্সের প্যারেন এর দিকে এবং অন্যটি মৌচুকি হয়ে সামসিং এর দিকে। আমরা প্রথম রুটটিকে নির্বাচন করলাম।

ন্যাওড়া ভ্যালি ন্যাশানাল পার্কটি কালিংপঙ জেলার অন্তর্গত। এই পার্কটি বেশির ভাগ অংশই এখনো মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি। কিছু কিছু জায়গায় তো এত ঘন জঙ্গল যে সূর্যের আলোও প্রবেশ করতে পারে না। এই পার্কটি সমুদ্র সমতল থেকে 400 মি. পর্যন্ত 3170 মি. পর্যন্ত বিস্তৃত। এর সর্বোচ্চ পয়েন্ট রেচেলার উচ্চতা হল 3170 মি। রেচেলা টপটি নেপাল, ভূটান এবং পশ্চিমবঙ্গের ট্রাই জংশন এ অবস্থিত। এই জঙ্গলটি জীব বৈচিত্র্যে ভরপুর। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে প্রধানত Indian Leopard, Civet, Black Bear, South Bear, Golden Cat, Wild Bear, Leopard Cat ইত্যাদি প্রাণীর দেখা পাওয়া যায়। তবে এই জঙ্গলটিতে অনেকগুলি Red Panda রয়েছে। তাছাড়া সরকারি হিসাব অনুযায়ী এখানে ১২ থেকে ১৫টি Royal Bengal Tiger ও রয়েছে। যদিও ২০০৮ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত তাদের দেখা পাওয়া যায় নি। ২০১৬তে একজন গাড়ির ড্রাইভার ন্যাওড়া ভ্যালিতে বাঘ দেখেন এবং তার ছবিও তোলেন।

স্তন্যপায়ী প্রাণী ছাড়া এখানে অনেক প্রজাতির পাখি দেখা যায়, যাদের মধ্যে মোনাল উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া এখানে King Cobra, Common Krait, Green Pit Viper প্রভৃতি সাপ এবং অনেক প্রজাতির প্রজাপতি দেখা যায়।

এই জঙ্গলটি মূলত ছোট বাঁশ রডোডেনড্রন, ওক, শাল ইত্যাদি গাছে সমৃদ্ধ। তাছাড়া এখানে বিভিন্ন প্রজাতির অর্কিড, ফার্ন প্রভৃতি পাওয়া যায়।

এইবার আবার আমরা ট্রেকিং এর কথায় ফিরে আসি। ন্যাওড়া ভ্যালি ন্যাশেনাল পার্ক-এ ট্রেকিং এর জন্য বনদপ্তর আধিকারিক এর অনুমতি নিতে হয়। আমরা কলকাতা থেকে e-mail করে আমাদের ট্রেক রুট এবং আমাদের নিজেদের সমস্ত বিবরণ পাঠিয়ে দিলাম। কয়েকদিন পরে আমাদের e-mail-এর উত্তর এলো এবং আমরা অনুমতি পেয়ে গেলাম। আমরা নির্দিষ্ট দিনে শিয়ালদহ থেকে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে চেপে বসলাম।

প্রথম দিন : আমরা সকাল ৭.০০টার সময় NJP Station এ নেমে একটা গাড়ি ঠিক করে লাভার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম। ১১.০০টা নাগাদ আমরা লাভা পৌঁছে গেলাম আগে থেকেই আমরা একজন গাইড এর সাথে কথা বলে রেখেছিলাম। তার নাম ছিল রমেশ এবং তার সাথে একজন মালবাহক গিয়েছিল সৌমেন নামে। আমরা লাভাতে গিয়ে প্রথমেই দুটো দলে ভাগ হয়ে গেলাম। একদলে চলে গেলাম ফরেস্ট অফিসে অনুমতি সংগ্রহ করতে আর একদলে গেল ট্রেনের জন্য প্রয়োজনীয় কেনাকাটা সারতে। এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা আবার রমেশের বাড়ির সামনে একত্র হলাম। তারপর একটা গাড়ি ঠিক করে। জিরো পয়েন্ট এর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম, যেখান থেকেই আমাদের হাঁটা শুরু। জিরো পয়েন্টে যেতে গেলে লাভা থেকে গাড়ি করে জঙ্গল এর মধ্যে দিয়ে ২৫ কিমি যেতে হয়। গাড়িতে যেতে যেতে হঠাৎ দেখি আমাদের গাড়ির সামনে দিয়ে একটি Red Panda দৌড়ে গেল। সেটি দেখে আমরা খুব উৎসাহিত হয়ে পড়লাম যে সামনের দিনগুলিতে না জানি আরো কত কিছু আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে। আমরা জিরো পয়েন্ট ১ কিমি এর আগে চৌদাফেরি জঙ্গল চেকপোস্ট আমাদের অনুমতি পত্র দেখিয়ে গাড়িতে করে জিরো পয়েন্ট পৌঁছালাম। এরপর আর গাড়ি যাবে না। আমাদের আজকের গন্তব্য ৬ কিমি দূরে ন্যাওড়া সোর্স ক্যাম্প বা PHE ক্যাম্প। কথা প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে ন্যাওড়া নদীই হল লাভা, লোলেগাঁও এবং কালিংপঙ এর জলের প্রধান উৎস।

এর পর আমরা যে যার স্যাক কাঁধে তুলে নিলাম এবং গাইড ও মালবাহক ও তাদের জিনিসপত্র এবং আমাদের খাবার, কেরোসিন তেল ইত্যাদি জিনিস তুলে নিল। আমরা এবার পায়ে হেঁটে ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। রাস্তা বলে তেমন কিছু নেই, শুধু একটি পথরেখা মাত্র। সেই পথরেখা অনুসরণ করে আমরা এগিয়ে চললাম। জঙ্গল ঘন থেকে আরো ঘন হতে লাগল। অনেক সময় মনে হচ্ছিল যে বন্য জন্তুরা আমাদের ওপর ঝোপের আড়াল থেকে নজর রাখছে। রাস্তা পুরোটাই উৎরাই জায়গায় জায়গায় পচা পাতার সাথে মাটি মিশে পথ যারপরনাই পিচ্ছিল হয়েছিল। আমরা খুব সতর্কভাবে পথ চলতে লাগলাম। প্রায় ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পথ চলার পর ন্যাওড়া নদী এবং নদীর অপর পাড়ে একটি থাকার জায়গা নজরে এলো। আমাদের গাইড রমেশ বলল যে 'স্যার জি, হাম লোগ পহুচ গ্যায়ে'। পৌঁছে গেছি তো বলে নিল, কিন্তু নদী পেরোবো কি করে ? এই প্রশ্নটা

আমাদের মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল, কারণ নদীর উপর কোনো সেতু ছিল না। আমরা নদী ধরে কিছুটা এগিয়ে একটা জায়গা গেলাম যেখানে জল একটু কম এবং কয়েকটি বড় বড় পাথর আছে। আমরা সবাই জুতো খুলে হাতে নিয়ে খুব সতর্কভাবে নদীটিকে পেরোলাম। তারপর চড়াই ভেঙ্গে কিছুটা উড়ে আমরা ক্যাম্পটির সামনে গিয়ে পৌঁছলাম। ক্যাম্পটি অনেকগুলি সরু বাঁশ পরপর সাজিয়ে দুটো আস্তরণ দিয়ে তৈরী। চারিদিকে জালে ঘেরা অসাধারণ সুন্দর এই ক্যাম্পটি সামনে দিয়ে ন্যাওড়া নদী বয়ে চলছে। এই ক্যাম্পটিতে তিনটি ঘর আছে, দুটিতে আমরা ৫ জন এবং একটিতে রমেশ আর সৌমেন রাতের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করলাম। ঘরগুলিতে শুধু দুটি করে কাঠের খাট এবং একটি করে টেবিল, পাশেই রান্না ঘর। আমরা সবাই স্যাক রেখে রান্নাঘরের দিকে গেলাম, তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। চা আর চিড়ে ভাজা সহযোগে আমাদের সন্ধ্যের টিফিন ভালই জমল। এরপর আমরা রান্নাঘরে বসে গল্পে মেতে উঠলাম আর তার সাথে আমাদের রাতের রান্না চলতে লাগল। আমাদের রাতের মেনু ছিল ভাত, ডাল, পাঁপড়ভাজা আর ডিমের ঝোল। আমরা খাবার শেষ করে স্লিপিং ব্যাগ এর ভেতরে ঢুকে পড়লাম। রাতে সহজে ঘুম আসছিল না, মনে হচ্ছিল যেন বাইরে কোনো বন্য জন্তু ঘুরে বেড়াচ্ছে। নানা চিন্তা এবং পরবর্তী দিনগুলির কথা ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম তা বলতে পারবো না।

দ্বিতীয় দিন : সকাল সকাল ঘুম ভেঙ্গে গেল। বাইরে বেরিয়ে দেখলাম যে অপরূপ সুন্দর একটা সকাল। নানান প্রজাতির পাখি ডাকছে, আমরা চা পান করে নিজেদের স্যাক গুছিয়ে নিলাম, আজ আমাদের গন্তব্য ৮ কিমি দূরবর্তী 'আলুবাড়ি'। ম্যাগি দিয়ে প্রাতঃরাশ সেরে আমরা স্যাক পিঠে তুলে নিলাম। আজকের রাস্তা ভয়ঙ্কর ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। কিছুটা যাওয়ার পর আবার আমাদের জুতো খুলে নিলাম নদী পারাপারের জন্য। আমাদের আজকের রাস্তার প্রথম 8 Km 'জরিবুটি' নামের ভ্যালির মধ্যে দিয়ে জরিবুটি কথার অর্থ হল ঔষধি গাছ। ন্যাওড়া ভ্যালি ঔষধি গাছে খুবই সমৃদ্ধ। এই খানে নানান প্রকারের দুর্লভ ঔষধি গাছ পাওয়া যায়। কিছুদূর চলার পর আমাদের আরও একবার নদী পেরোতে হল। আমরা সবাই এখানে একসাথে হাঁটছি, কারণ জঙ্গলের এই অংশটি খুবই বিপজ্জনক। অনেক প্রজাতির বন্যজন্তুর সাথে দেখা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আরো তিন বার নদী পেরোনোর পর আমরা দূরে একটি ওয়াচ টাওয়ার দেখতে পেলাম। এটি হল জরিবুটি ওয়াচ টাওয়ার। আমরা ওয়াচ টাওয়ারের সামনে পৌঁছে দেখি যে ওয়াচ টাওয়ারের উপরে যাওয়ার সিঁড়িগুলি ভগ্নপ্রায়, আমরা কয়েকজন কোনোমতে উপড়ে উঠলাম। উপর থেকে অনেকটা এলাকা দেখা যাচ্ছিল। এই অঞ্চলটা পুরো ছোট ছোট বাশ গাছ ভর্তি। কিছুক্ষণ থেকে আমরা নিচে নেমে এলোম। ওয়াচ টাওয়ারের সামনের মাটিটা দেখা গেল যে খুব ফালা ফালা করে ওলট পালট করা। দেখে মনে হচ্ছিল যে কেউ কিছু দিয়ে খুপিয়েছে। গাইডকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল এটা বুনো শুয়োরের কাজ। ওরা দাঁত দিয়ে মাটি খুঁড়ে নিজেদের খাবার খায়। এরপর আবার পথ চলতে শুরু করলাম, এই রাস্তাটি একটু বিপজ্জনক। কারণ রাস্তাটির বাম দিকে নদী আর ডান দিকে দেড় মানুষ সমান উঁচু সরু বাঁশের জঙ্গল। সেই সরু বাঁশের জঙ্গল এতো ঘন যে ৩-৪ ফুট দূরের জিনিসও দেখা যায় না, ফলে কোনো জন্তু যদি জলের সন্ধানে আসে তা হলে তাকে আগে থেকে দেখা আমাদের পক্ষে সম্ভব না। তাই আমরা এক সাথে এবং খুব সতর্ক ভাবে পথ চলতে লাগলাম। জরিবুটি ওয়াচ টাওয়ার থেকে 2 Km মতো চলার পর আমরা একটু ফাকা জায়গায় এসে উপস্থিত হলাম। আমাদের গাইড বলল যে এবার আমাদের আবার নদী পার করে চড়াই রাস্তায় যেতে হবে। পথে আর কোথাও জলের উৎস নেই। তাই আমরা জল খেয়ে এবং নিজেদের জলের বোতলে জল ভরে নিলাম। তার পর

জুতো খুলে নদী পেরিয়ে আবার জুতো পড়ে চড়াই ভালা শুরু করলাম। এখানে জালের প্রকৃতি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে লাগল। ঘন জঙ্গলের বদলে একটু ফাঁকা ফাঁকা এবং ছোট বাঁশ এর সাথে সাথে অনেক রকমের বড় গাছও দেখা গেল। প্রায় ১.৫ ঘন্টা যাওয়ার পর আরেকটা ওয়াচ টাওয়ার পড়ল, এখানেও সিঁড়ি ভাঙ্গা। তাই উপরে উঠতে পারলাম না। ঠিক তখনি বেশ জোরে বৃষ্টি শুরু হল। আমরা ওয়াচ টাওয়ারটির নীচের আশ্রয় নিলাম। প্রায় ৩০ মিনিট পর বৃষ্টি একটু কমতে আমরা আবার চলা শুরু করলাম। ২০মি. পর আমরা দূরে পাহাড়ের ঢালে একটি ফরেস্ট ক্যাম্প দেখতে পেলাম। আমাদের গাইড বলল যে ওটাই আলুবাড়ি ক্যাম্প। আর ১৫ মিনিট এর মধ্যে আমরা আলুবাড়ি ক্যাম্প এ পৌঁছে গেলাম। আমরা পৌঁছানোর সাথে সাথে আবার বৃষ্টি নামল। আমরা দুটো ঘরে আশ্রয় নিলাম, রমেশ এবং সৌমেশ আমাদের গরম গরম চা এনে দিল এবং দুপুরের খাবার তৈরী করতে শুরু করল।

আমরা যেখানে আছি সেটার নাম আলুবাড়ি। এখানে আলুর চাষ হত। সেই থেকেই এই নাম, ১৯৮৬ সালে ন্যাওড়া ভ্যালি সংরক্ষিত অরণ্য রূপে স্বীকৃতি পায়। তার আগে এখানে একটি গ্রাম ছিল এবং প্রচুর পরিমাণে আলুর চাষ হত। সংরক্ষিত অরণ্যের নিয়ম অনুযায়ী কোনো লোকবসতি রাখা যায় না। তাই গ্রামটি জালের বাইরে অন্য কোথাও চলে যায়। আলুবাড়ি জায়গাটি পুরো জঙ্গলে ঘেরা এখানে চারি দিকে প্রচুর পাখির সমাবেশ চোখে পড়ার মতো। তাদের মিষ্টি কূজনে সমস্ত জায়গাটি ভরে ছিল। ক্যাম্প সাইডটি বাদ দিয়ে বাকি সবটাই বেশ ঘন। আমরা দুপুরে খাওয়া দাওয়া শেষ করে বাইরে বসে রইলাম। আমাদের আজকের মেনু ছিল ভাত, ডাল, আলুভাজা আর সোয়াবিনের তরকারি আস্তে আস্তে চারিদিকে অন্ধকার নেমে এলো। বিকেলের আলোয় জঙ্গলের অসাধারণ রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করলাম। পাখির ডাক বদলে গেল ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকে এবং চারিদিকে একটি অদ্ভুত নিস্তব্ধতা নেমে এলো। আমরাও ক্যাম্পের বারান্দায় চা এবং চিঁড়ে ভাজা সহযোগে গল্প করতে বসলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ এর মধ্যে ঠান্ডা বেড়ে যাওয়ার দরুণ রান্না ঘরে আশ্রয় নিলাম। আমাদের রাতের রান্না চলতে থাকল। রাতে আমরা আলুর দম আর রুটি খেয়ে যে যার স্লিপিং ব্যাগের ভিতর আশ্রয় নিলাম।

তৃতীয় দিন: সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠলাম। আজকের আবহাওয়া ভালোই। আকাশ পরিষ্কার, আজকে আমাদের যেতে ০৮ কিমি দূরবর্তী রেচেলা টপ-এ, আমরা সবাই তৈরি হয়ে নিলাম। সকালে ম্যাগি খেয়ে আমরা আলুবাড়িকে বিদায় জানিয়ে রেচেলার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। শুরুতেই দম ফাটা চড়াই। সরু বাঁশের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আমরা ধীরে ধীরে চড়াই ভেঙ্গে এগোতে লাগলাম। কিছুদূর যাওয়ার পর পথের প্রকৃতি পরিবর্তন হতে লাগল সামনের রাস্তাটি অনেকটা ইংরাজির 'U' এর মতো। দুপাশে মাটির উঁচু দেওয়াল আর তার উপরে বাঁশ ও রডোডেনড্রন গাছের ছাদ, মনে হচ্ছিল যেন আমরা কোনো প্রাকৃতিক গুহার ভেতর দিয়ে হেঁটে চলেছি। বাইরের আকাশ পরিষ্কার থাকলেও এই রাস্তাটি অন্ধকারাচ্ছন্ন, আলো এতোই কম যে ঠিক মত ছবিও তোলা সম্ভব হচ্ছিল না। প্রায় ১ ঘন্টা এই ভাবে চলার পর আমরা কিছুটা খোলা জায়গায় এসে পড়লাম। আমরা একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার পথ চলা শুরু করলাম। এই পুরো রাস্তায় কোথাও কোনো জলের উৎস নেই আমাদের সাথে থাকা বোতলের জলই ভরসা। পথে আরো কিছু গাছের গুহা মতন পড়ল। ধীরে ধীরে আমরা রেচেলা লেক এর সামনে এসে দাঁড়ালাম। এটি মাঝারি মাপের একটি জলাধার এবং এখানকার একমাত্র পানীয় জলের উৎস। জলটা বেশ নোংরা আশেপাশে প্রচুর গাছ থাকার দরুন ঐ গাছের পাতা এই জলে এসে পড়ে। আমরা তখন আমাদের গাইডকে প্রশ্ন করলাম যে এই জলই কি আমাদের খেতে হবে। তখন গাইড জানাল তা ছাড়া আমাদের কোনো বিকল্প নেই। তারপর আরো বলল যে এই

জলাধারটিকে স্থানীয়রা 'দাওয়াই খোলা' , বলে কারণ এখানকার জল ঔষধি গুণসম্পন্ন, এই জল খেলে অনেক ধরনের শারীরিক সমস্যা দূর হয়। তাই জঙ্গলের বাইরের গ্রামের লোক জল এইখান থেকে জল নিয়ে যায়। আমরাও আমাদের জলের ড্রাম দুটি ভরে নিলাম। এইখান থেকে দুটি রাস্তা চলে গেছে। একটি ২০০ মি. দূরবর্তী রেচেলা ক্যাম্প এর দিকে তার একটি চড়াই রাস্তা ৫০০ মি. দূরবর্তী রেচেলা টপ এর দিকে। আমরা আগে ক্যাম্প এ গিয়ে আমাদের জিনিসপত্র রেখে আসবো ঠিক করলাম। ক্যাম্পের সামনে এসে দেখি আগের দুটি ক্যাম্পএর সাথে এটির কোনো মিল নেই। এটির অবস্থা খুবই খারাপ। একটি কাঠের ঘর ছাড়া আর কিছুই নেই। সামনের মাটি পুরো উলট পালট হয়ে কাদায় মাখামাখি, রান্নাঘরের দুদিকের দেওয়ার নেই। ঘরে ঢুকে দেখি অবস্থা খুব খারাপ। স্তূপাকারে কোনো প্রাণীর বিষ্ঠা পড়ে আছে। গাইডকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল এই গুলি বাইসনের। কিন্তু এতো উপরে বাইসন কি করে এল সেটা আমাদের বোধগম্য হল না, কারণ সমুদ্র সমতল থেকে ৩০০০ মি. উপরে আছি। তাছাড়া ঘরময় কাদা। আমরা কোনো মতে একটা ঘরের কোনার দিকটা পরিষ্কার করে আমাদের সঙ্গে থাকা প্লাস্টিক সিট টিকে পেতে আমাদের শোয়ার উপযোগী জায়গা তৈরী করে নিলাম। তারপর দুপুরের রান্নার আয়োজন করতে লাগলাম । সোয়াবিনের তরকারী আর ভাত খেয়ে আমরা রেচেলা টপ এর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। প্রায় ৩০ মি. চলার পর আমরা রেচেলা টপ এ উপস্থিত হলাম। কিন্তু ভাগ্য দেবতা আমাদের সহায় ছিল না। চারিদিকে মেঘ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না। ধীরে ধীরে সন্ধে ঘনিয়ে আসতে লাগল এবং তার সাথে পাল্লা দিয়ে হিমেল হাওয়ায় প্রকোপও বাড়তে লাগল। আমরা ক্যাম্পের দিকে ফিরে চললাম। ক্যাম্পে ফিরে আমরা চা আর চিড়ে ভাজা খেয়ে রান্না ঘরের আগুনকে ঘিরে সবাই মিলে জড়ো হয়ে বসলাম। ঠান্ডা বেশ ভালোই, আমরা ঠিক করলাম যে আজ রাতে আর রান্নার বেশ ঝামেলা করে লাভ নেই। তাই আমরা খিচুড়ি বসিয়ে দিলাম। খিচুড়ি খেয়ে আজকে আমরা অন্যদিকের থেকে একটু তাড়াতাড়িই স্লিপিং ব্যাগ এর আশ্রয়ে চলে গেলাম।

চতুর্থ দিন : আমরা আজকে বেশ তাড়াতাড়ি উঠে গায়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে গরম পোষাক চাপিয়ে রেচেলা টপ এর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা রেচেলা টপ এ উপস্থিত হলাম। ঠান্ডা হাওয়ার কামড় আমাদের ফেদার জ্যাকেট ভেদ করে শরীরে বসে যাচ্ছিল। কিন্তু আজকে আমরা সেই সব ভুলে গেলাম। আমরা রেচেলা টপ-এ দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের বাম দিকে সপারিষদ কাঞ্চনা, সামনের দিকে সিকিম, ছাঙ্গু লেক, নাথুলা পাস আমাদের চোখের সামনে। ডান দিকে ভুটান, ভূটানের কিছু বরফ আচ্ছাদিত পাহাড় ও আমাদের চোখে পড়ল এবং আমাদের পেছন দিকে পশ্চিমবঙ্গ। যতদূর চোখ যায় ঘন অরণ্য যার মধ্যে দিয়ে আমরা গত তিনদিন ধরে হেঁটে এসেছি। আমরা প্রায় ১ ঘণ্টা মত রেচেলা টপ এ ছিলাম। প্রচুর ছবি তুললাম।

এবার আমাদের ফেরার পালা, রেচেলা টপ থেকে আমরা রেচেলা ক্যাম্প এ ফিরে এলাম, সেখানে ফিরে আমাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলাম। কিছু বেচে যাওয়া শুকনো খাবার এবং কেরোসিন তেল আমরা ক্যাম্পের মধ্যেই রেখে দিয়ে গেলাম পরবর্তী অভিযাত্রীদের সুবিধার জন্য। আমাদের আজকের রাস্তা পুরোটাই উৎরাই। আবার সেই মাটির গুহার মধ্যে দিয়ে ক্রমাগত নিচের দিকে নামতে থাকলাম। এখানে জঙ্গল খুবই ঘন এবং স্যাতস্যাতে। আমরা আমাদের জামাকাপড়ের মধ্যে জোঁকের অস্তিত্ব অনুভব করতে লাগলাম। মাঝে মধ্যে দাঁড়িয়ে জোঁক ছাড়াতে হচ্ছিল। প্রায় ৫ ঘণ্টা চলার পর আমরা ন্যাওড়া ভ্যালির সীমানায় এসে উপস্থিত হলাম। এখানে সিকিমের মূলখারকা চেকপোস্ট। পুরো রাস্তায় কোথাও কোনো জলের উৎস ছিল না। আমাদের বোতলের জলও শেষ। মূলখাকরা চেকপোস্টে এসে আমরা জল পেলাম। জলপান করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আমরা মুলখারকা

আমাদের পা গুলি বেশ ব্যথা করতে লাগল। বিশেষত হাঁটুর নিচে প্রচন্ড চাপ পড়ে ছিল। আমরা হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসলাম।

খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিয়ে আমরা গ্রাম পরিদর্শনে বেরোলাম। সন্ধ্যেবেলা হোম স্টের লোকেদের সাথে গল্প করতে বসলাম। রাতে খেয়ে নিয়ে আমরা একটু তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লাম।

পঞ্চম দিন : আমরা সকালে ঘুম থেকে উঠে বাইরে বেরিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। গ্রাম থেকেই সপারিষদ কাঞ্চনজঙ্ঘা দৃশ্যমান। আমার চা, প্রাতঃরাশ করে আমাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। প্রায় ১ কিমি গ্রামের মধ্যে দিয়ে চলার পর আমরা গাড়ির রাস্তায় এসে উপস্থিত হলাম। আমাদের হোম স্টের মালিক আগের থেকেই আমাদের

জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। আমরা গাড়িতে উঠে রেনকের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। রেনকে আমাদের গাইড এবং মালবাহক বন্ধুদের বিদায় জানিয়ে আমরা ঝান্ডিখোলার দিকে এগিয়ে চললাম। সকাল এগারোটা নাগাদ আমরা ঝান্ডিখোলাতে পৌঁছে গেলাম।

সেখানে একরাত কাটিয়ে আমরা কালিংপর হয়ে NJP তে চলে আসি এবং সেখানে থেকে ট্রেন ধরে মন খারাপ নিয়ে ফিরে এলাম। যদিও পথের বাঁকে বাঁকে প্রতিশ্রুতি রেখে এলাম যে, আমরা আবার এই সুন্দরের উয় সান্নিধ্য পেতে আসব।

--আরাত্রিকা মন্ডল

# স্মরণীয় অভিজ্ঞতা

- অমিত কুমার দে

বাসটা যখন হাওড়ায় এসে পৌঁছালো তখন ধরে প্রাণ এল। কেন, সেটা একটু পরে বলছি কারণ সেটাই লেখবার বিষয় ও জীবনের ভয়ংকর স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। প্রায় ৩০ বছর আগের কথা চাকরিতে নতুন, বছরখানেক হয়ে গেল কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয়নি। মনটা তাই ছটফট করছিল। সেই সময় পেয়ে গেলাম পর পর তিন দিনের ছুটি। ১৩,১৪ ও ১৫ ই আগস্ট। Plan programme করা হয়ে গেল। আমাদের ক্লাবের হলিডে হোম ঠিক করাও হয়ে গেল। কতজন যাবে? কি কি জিনিস নিয়ে যাওয়া হবে? কত টাকা করে লাগবে? ঠিক হয়ে গেল, আমরা দীঘা যাওয়ার জন্য এক পা বাড়িয়ে রাখলাম। কিন্তু ফিরে এসে নাক, কান মুলেছি আর কোনদিন কোন occasion এ দীঘা বেড়াতে যাব না। আমাদের এত দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে যা এক কথায় অকল্পনীয়। তার সঙ্গে রয়েছে আমাদের অনভিজ্ঞতা, নির্বুদ্ধিতা। কথায় আছে না, মানুষ দেখে শেখে আর ঠেকে শেখে। আমরা ঠেকেই শিখেছিলাম যা কোনদিনই ভোলা সম্ভব না। আমরা দলে পাঁচজন ছিলাম। এস বি এস টি সির বাসে দীঘা পৌঁছেছিলাম। বাস স্ট্যান্ড লোকে লোকারন্য, অনেক কষ্টে টিকিট পেয়েছিলাম। তখনই বুঝেছিলাম কপালে অনেক দুঃখ আছে। দীঘা পৌঁছে চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। সি বিচ, হোটেল, রেস্তোরা, রাস্তাঘাট থিক থিক করছে লোক। তার মধ্যেই আমাদের বেড়ানো চলছিল। সমস্যা দেখা দিল ফেরার সময়। সেটাই আলোচ্য বিষয়, স্মরণীয় ঘটনা।

তখন ট্রেনে যাতায়াত কতটা ছিল জানিনা তবে বেশিরভাগই বাসে যেত। আমরাও ফেরার দিন অর্থাৎ ১৫ তারিখ বাসস্ট্যান্ডে গেলাম বিকালের দিকে। জন সমুদ্রে গিয়ে পড়লাম। এস বি এস টি সি, সি এস টি সি অর্থাৎ সরকারি কোনো বাস নেই। অগত্যা প্রাইভেট বাসের সন্ধানে গেলাম। সেখানেও 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ছোট সে তরী '। সেই রকম একটি প্রাইভেট ডিলাক্স বাসের কন্ডাক্টার ও হেলপার আমাদের বুদ্ধি দিল, আপনারা বাসের ছাদে উঠে যায়। বাস খানিকটা যাবার পর রামনগর বা কাঁথির পর আপনাদের নিচে বাসের ভেতরে নামিয়ে নেব। ভাড়া কম, অর্ধেক লাগবে। আমরাও প্রবল উৎসাহে বাসের মাথায় উঠে পড়লাম। একটা thrilling ব্যাপার হবে। আর কোনভাবে ফেরা তো যাবে। পরদিন অফিস আর এক বন্ধুও বাড়ির ফেরার জন্য ছটফট করছিল। না হলে একবার ভাবা হয়েছিল আর একটা দিন হলিডে হোমে থেকে পরের দিন যাব। ফোন করে বাড়িতে জানিয়ে দিলেই হবে। তখন মোবাইল কারোর কাছেই নেই ল্যান্ড ফোনই ভরসা। এক বন্ধু নাছোড়বান্দা, তাছাড়া কপালে দুর্ভোর্গ লেখা ছিল যে। যাক বাস ছাড়লো আমরা বাসের ছাদে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, আকাশ কালো। কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি এলো সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া। রাস্তার ধারে ঝাউ, দেবদারু, ইউক্যালিপ্টাস গাছের ডালগুলো ঝড়ের দাপটে বাসের ছাদের উপর পড়ছিল আবার উঠে যাচ্ছিল। কোনক্রমে মাথা নিচু করে বেঁচে যাচ্ছি। বৃষ্টির বেগও বাড়ছে আমরা সকলে কাকভেজা ভিজে গেছি। সেই সঙ্গে ৭০ থেকে ৮০ কিলোমিটার ঘণ্টায় বাস ছুটছে। এই সময় বাঁশের মাথায় একটি ত্রিপল পাওয়া গেল বিরাট সাইজের। আমরা সবাই পুরো শরীর ঢেকে বসলাম। আমরা মানে পাঁচ জন ও আরও তিন চার জন ছিল। ওরা কাঁথি, মেচেদা সব নেমে যাবে। বাইরে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। ঝড় সমানে চলছে, গাছের ছোট ডাল পালা গুলো ফটফট করে ত্রিফলের উপর মাথায় লাগতে লাগতে যাচ্ছে। যদি বড়, মোটা কোন ডাল এসে লাগে খুলিটা উড়ে যাবে আর তৎক্ষণাৎ ভবলীলা সাঙ্গ হবে।

আমরা ত্রিপলের তলায় কৃষ্ণ নাম জপছি। এইভাবে আরো ২০-২৫ মিনিট কাটল। আস্তে আস্তে বৃষ্টি ও ঝড়ের বেগ কমলো। ত্রিপল  খুলে ভালোভাবে শ্বাস নিলাম, বৃষ্টি একেবারে থামল। বাস ততক্ষণে কাঁথি। আমরা বাসের ভিতর ঢুকলাম। দুই না তিন জন নেমেছিল সবার বসার জায়গা হলো না। ঠিক করলাম দাঁড়িয়ে যাওয়ার চেয়ে বাসের ছাদে যাওয়াই ভালো। ততক্ষণে বৃষ্টি থেমে আকাশ পরিষ্কার। বাসের মাথায় ঐ রকম ঝড়ের মত হাওয়া জামা কাপড় সব শুকিয়ে গেল। বাস হাওড়া এসে পৌঁছালো, তখন রাত দশটা বেজে গেছে। বাড়ি ফেরার তারায় যে যার মত দৌড়াচ্ছে, শরীরে তখন আবার নতুন করে জীবন ফিরে পাওয়ার উচ্ছাস। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম ১৫ই আগস্ট দীঘা আর নয়। তারপর দীঘা আরো বার  চারেক গেছি, কিন্তু ১৫ ই আগস্ট ফিরিনি। এই আমাদের জীবনের একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা যা কোনদিনও ভোলার নয়।

***

**--বর্ষা মন্ডল**

বই কুটির

কলকাতা

শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও
আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন

+91-9903129991

boikutirkolkata@gmail.com

https://www.facebook.com/Boi-kutir-kolkata-বই-কুটির-কলকাতা-123508622632570/

https://www.boikutirkolkata.co.in

https://www.instagram.com/Boi_Kutir_Kolkata/